রিপোর্টারের জন্য এমডিজি

আসজাদুল কিবরিয়া

রিপোর্টারের জন্য এমডিজি

আসজাদুল কিবরিয়া

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০০৯

অলংকরণ ও মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট

ISBN : 978-984-33-0902-0

বাংলাদেশে মুদ্রিত

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
২/৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ই-মেইল : info@mrdibd.org, ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

বিষয়সূচি

ভূমিকা	১
এমডিজির সূত্রপাত	৩
লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ	৪
বাংলাদেশ : এমডিজি	১৫
এমডিজির সরলপাঠ	৩০
এমডিজি নিয়ে প্রতিবেদন : কিছু পরামর্শ	৪৯
প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইট	৬৬

ভূমিকা

সাংবাদিকতার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের কাছে 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' বা 'এমডিজি' (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) এখন পরিচিত শব্দ। জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত এমডিজি নিয়ে নানা ধরনের তৎপরতা চলছে। চলছে সভা-সেমিনার। আয়োজন হচ্ছে মানববন্ধন। এমডিজি নিয়ে কর্মকাণ্ডের কোনো অভাব নেই। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন সময়ে ব্যাপকভিত্তিক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এমডিজি নিয়ে। পত্রপত্রিকায় এমডিজি নিয়ে খবর আসছে। ছাপা হচ্ছে প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও নিবন্ধ।

এ রকম একটা পরিপ্রেক্ষিতে সহজ করে এমডিজি বোঝা ও এমডিজি বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য একটি সহায়িকা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়। সেই চিন্তা থেকে এই হ্যান্ডবুক বা সহায়িকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

হ্যান্ডবুক বা সহায়িকাটি সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের কাজকে আরেকটু সহজ করার জন্য প্রণীত। কেউ যদি এখান থেকে এমডিজি বিষয়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন, তাহলে তা ঠিক হবে না। তবে, এমডিজি বলতে কী বোঝায় বা বাংলাদেশে এমডিজির অবস্থা কী—সে সম্পর্কে অল্প কথায় প্রাথমিক ধারণা দেয় হয়েছে এখানে। একই সঙ্গে কীভাবে ও কোত্থেকে এমডিজি বিষয়ে বিস্তারিত জানা ও বোঝা সম্ভব, তারও কিছু তথ্য দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এমডিজি-বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে একজন প্রতিবেদকের কী

কী কাজ করা প্রয়োজন হতে পারে, সে সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এগুলোই যে সব সময় সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, এমনটি নয়। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এসব পরামর্শের প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বের কম-বেশি হতে পারে।

সাংবাদিকদের জন্য পাঠক-বান্ধব এই সহায়িকাটি প্রণয়ন করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন সাংবাদিক আসজাদুল কিবরিয়া, উপ-বাণিজ্য সম্পাদক, দৈনিক প্রথম আলো। এটি প্রণয়নের জন্য দেশের কয়েকটি প্রধান দৈনিকের কয়েকজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এবং উন্নয়নকর্মীর সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়েছে। খসড়া দেখে পরিমার্জনা ও মান উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন কুর্‌রাতুল-আইন-তাহ্‌মিনা। আরও পরামর্শ দিয়েছেন ইনাম আহমেদ, শাহরিয়ার খান ও শরিফুজ্জামান পিন্টু। কিছু বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন উদিসা ইসলাম। তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।

এই সহায়িকা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘ সহস্রাব্দ প্রচারাভিযান (ইউএনএমসি) বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার দাবিদার।

মিডিয়ার জন্য এমডিজি বিষয়ক প্রতিবেদন তৈরিতে এই প্রকাশনা কিছুটা সহায়ক হলেও আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে।

এমডিজির সূত্রপাত

বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুই ধরনের কৌশল নির্ধারণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। একটি হলো বিশ্বব্যাংকের দিক থেকে, অপরটি হলো জাতিসংঘের। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এমডিজি) হলো দ্বিতীয় ধরনের কৌশল নির্ধারণের চেষ্টা।

বিশ্বের উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসন কর্মসূচিকে গতিশীল করার জন্য ২০০০ সালের ৬—৮ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয় সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক (Millennium Summit)। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনেই জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর জন্য একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাওয়ার অভীষ্ট লক্ষ্য (Millennium Development Goals) গৃহীত হয়। বস্তুত এটি ছিল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশন, যেখানে সব সদস্য রাষ্ট্র একমত হয়ে কয়েকটি লক্ষ্য বা Goals স্থির করে যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (Millennium Development Goals) বা এমডিজি নামে পরিচিত। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও এই কাজে একাত্মতা ঘোষণা করে।

এটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ-ব্যাধি, বৈষম্য, পরিবেশ-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণের চেষ্টা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এমডিজি ঘোষণায় জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য রাষ্ট্র স্বাক্ষর প্রদান করার মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে এসব লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব

জোরদার করার অঙ্গীকার প্রদান করেছে। ১৯৯৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এমডিজিকে সফল করে তোলার জন্য জাতিসংঘের সহস্রাব্দ প্রকল্প ও প্রচারাভিযান দুনিয়াজুড়ে কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ

- এমডিজির আটটি প্রধান লক্ষ্য (Goal) রয়েছে। এই প্রধান লক্ষ্যগুলোর সমন্বয়ে আমরা পাই লক্ষ্যসমূহ (Goals)। বাংলায় আমরা যাকে বলছি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ। ২০১৫ সালের মধ্যে যা অর্জন করতে চাওয়া হচ্ছে, প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো বৃহত্তর আঙ্গিকে তার প্রকাশ। এই লক্ষ্যগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে অর্জন করার জন্য তাই নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ২১টি লক্ষ্যমাত্রা (Target)। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলোর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় যে প্রধান লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কতখানি অগ্রগতি হয়েছে। আর লক্ষ্যমাত্রাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে যাচাই করার জন্য অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্রের এই অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০টি সূচক (Indicator)। এই সূচকগুলোই বলে দেবে যে লক্ষ্যমাত্রায় অগ্রগতি কতখানি হয়েছে।

- এখানে বলে রাখা দরকার যে জাতিসংঘ নির্ধারিত কোনো লক্ষ্যের কোনো সূচকের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্র তার নিজস্ব বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সূচক পুনর্নির্ধারণ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের কথাই বলা যায়। একেবারে প্রথম

লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্যমাত্রাতেই বাংলাদেশ দারিদ্র্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ক্যালোরি গ্রহণভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে যেখানে মূল এমডিজিতে আছে ক্রয়ক্ষমতা সমতার (পিপিপি) আলোকে জনগোষ্ঠীর শতকরা হার।

- তবে প্রথম অবস্থায় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৮টি ও সূচক ছিল ৪৮টি। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে মহাসচিব এমডিজিতে নতুন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেন। এরই ফলে নতুন তিনটি লক্ষ্যমাত্রা যুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে যুক্ত হয় ১২টি সূচক। পাঁচটি হালনাগাদ করা হয়। ২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে সংশোধিত এই তালিকা কার্যকর হয়।

- সংবাদপত্রের জন্য কোনো প্রতিবেদন তৈরি করার ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়ের (লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক) পারস্পরিক সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বোঝা খুব জরুরি। তা না হলে পুরো বিষয়টি নিয়ে গোলমাল হতে পারে। নিচে আমরা প্রথমে আটটি প্রধান লক্ষ্য এবং এগুলোর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলো তুলে ধরেছি। তারপর সেগুলো আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশের চিত্র তুলে আনা হয়েছে।

- আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে এমডিজির প্রায় প্রতিটি লক্ষ্যই ২৫ বছর সময়সীমার মধ্যে অর্জনের জন্য বলা হয়েছে। সাধারণভাবে ১৯৯০ সালকে ভিত্তি বা সূচনাকাল ধরে ২০১৫ সালের মধ্যে শেষ করা। ক্ষেত্রবিশেষে এর ব্যত্যয় ঘটেছে এবং সে ক্ষেত্রে সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : লক্ষ্যমাত্রা ১৫।

লক্ষ্য ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা

লক্ষ্যমাত্রা ১

যাদের আয় দৈনিক ১ ডলারের কম, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যায় তাদের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাসকরণ [মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের আয় দৈনিক ১ পিপিপি (ক্রয়ক্ষমতার সমতায়) ডলারের কম, তাদের সংখ্যা ১৯৯০ সালে যা ছিল, ২০১৫ সালে যেন তার অর্ধেক হয়]

সূচকসমূহ

১. ক্রয়ক্ষমতার সমতায় (পিপিপি) দৈনিক ১ ডলারের কম—জনসংখ্যায় এমন জনগোষ্ঠীর শতকরা হার।

২. দারিদ্র্য-ব্যবধান অনুপাত

৩. জাতীয় ভোগে চরম দরিদ্রদের (সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশ) আনুপাতিক অংশ

লক্ষ্যমাত্রা ২

পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অর্জন এবং নারী ও যুবাসহ সবার জন্য মানসম্মত কাজ

সূচকসমূহ

৪. কর্মরত মানুষের মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার

৫. জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার

৬, মাথাপিছু আয় ১ পিপিপি ডলারের কম, এমন কর্মজীবী মানুষের আনুপাতিক হার

৭. মোট কর্মসংস্থানে স্বনিয়োজিত ও পারিবারিকভাবে কর্মরতদের অংশ বা আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ৩

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধাপীড়িত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস [এই অর্ধেকে হ্রাস বা অর্ধেকে নামানোর সময়কালটি ধার্য করা হয়েছে ২৫ বছর। মানে ১৯৯০ সালকে ভিত্তি ধরে ওই বছর যা থাকছে ২০১৫ সালে তা যেন অর্ধেকে নেমে আসে]

সূচকসমূহ

৮. পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের মধ্যে যারা স্বল্প ওজনের, তাদের সংখ্যা

৯. যারা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না, জনগোষ্ঠীতে তাদের আনুপাতিক অংশ

লক্ষ্য ২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৪

২০১৫ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে-নির্বিশেষে সব শিশু যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা

সূচকসমূহ

১০. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ভর্তির প্রকৃত হার

১১. প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠ শেষ করেছে, এমন ছাত্র-ছাত্রীর শতকরা হার

১২. ১৯ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের (নারী ও পুরুষ) সাক্ষরতার হার

লক্ষ্য ৩ : নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

লক্ষ্যমাত্রা ৫

২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা

সূচকসমূহ

১৩. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ছাত্রী ও ছাত্রের অনুপাত

১৪. বিভিন্ন অকৃষি খাতে বেতনভুক কর্মী নিয়োগে নারীর অংশগ্রহণের হার

১৫. জাতীয় সংসদে নারী সাংসদদের আনুপাতিক হার

লক্ষ্য ৪ : শিশুমৃত্যু হ্রাস

লক্ষ্যমাত্রা ৬

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস

সূচকসমূহ

১৬. পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুদের মৃত্যু-হার

১৭. এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার

১৮. এক বছর বয়সী হামের টিকা গ্রহণকারী শিশুর আনুপাতিক অংশ

লক্ষ্য ৫ : মাতৃ-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা ৭

১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার তিন চতুর্থাংশ হ্রাস

সূচকসমূহ

১৯. মাতৃমৃত্যুর হার

২০. জন্মের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা পাওয়ার আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ৮

২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

সূচকসমূহ

২১. জন্মনিরোধক ব্যবহারের হার

২২. কিশোরী মাতৃত্বের হার (১৫–১৯ বছর বয়সে মা হওয়ার আনুপাতিক হার)।

২৩. শিশু জন্মের আগে (গর্ভকালীন) মায়ের সেবা প্রাপ্তি

২৪. পরিবার পরিকল্পনার অপূর্ণ চাহিদার হার

লক্ষ্য ৬ : এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের মোকাবিলা

লক্ষ্যমাত্রা ৯

২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা কমতে থাকা।

সূচকসমূহ

২৫. ১৫–২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার

২৬. কনডম ব্যবহারের হার (সর্বশেষ উচ্চ ঝুঁকি যৌন মিলনে)

২৭. এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে ১৫–২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এমন সংখ্যা

২৮. ১০–১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে এতিমদের আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ১০

যাদের প্রয়োজন তাদের সকলের ২০১০ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস চিকিৎসা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি

সূচক

২৯. এইচআইভির উচ্চ সংক্রমণের মধ্যে থেকে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল বা ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে এমন জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ১১

২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াসহ অন্য প্রধান রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস

সূচকসমূহ

৩০. ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং রোগজনিত মৃত্যুর হার

৩১. ওষুধ দেওয়া মশারির মধ্যে ঘুমায় পাঁচ বছরের কম বয়সী এমন শিশুর আনুপাতিক হার

৩২. ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক ওষুধ পায় পাঁচ বছরের কম বয়সী জ্বর-আক্রান্ত এমন শিশুর আনুপাতিক হার

৩৩. যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং রোগজনিত মৃত্যুর হার

৩৪. সরাসরি তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে স্বল্পকালীন চিকিৎসা-প্রাপ্তির সাহায্যে (ডটস) সন্ধানকৃত এবং চিকিৎসাপ্রাপ্ত যক্ষ্মারোগীর আনুপাতিক হার

লক্ষ্য ৭ : টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ১২

জাতীয় পর্যায়ের নীতি ও কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশ সম্পদের ক্ষয়রোধ

লক্ষ্যমাত্রা ১৩

জীববৈচিত্র্যের হানি রোধ ও ২০১০ সালের মধ্যে ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে কমানো

সূচকসমূহ

৩৫. দেশের আয়তনে বনভূমির আনুপাতিক হার (শতকরা)

৩৬. মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ

৩৭. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী সিএফসি সামগ্রীর ব্যবহারের মাত্রা

৩৮. মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরাপদ জীবসীমায় রাখার আনুপাতিক হার

৩৯. ব্যবহৃত মোট পানিসম্পদের আনুপাতিক হার

৪০. জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার জন্য সংরক্ষিত স্থলভাগ ও জলাভূমির আনুপাতিক হার

৪১. ধ্বংসের হুমকির মুখে থাকা প্রজাতির আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ১৪

নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি পায় না, জনসংখ্যায় এমন জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে হ্রাস

সূচকসমূহ

৪২. নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার

৪৩. উন্নততর পয়োনিষ্কাশনের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ১৫

২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষণীয়ভাবে উন্নত করা

সূচকসমূহ

৪৪. নগরবাসীর মধ্যে বস্তিবাসীর আনুপাতিক হার

লক্ষ্য ৮ : উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

[এর কিছু শুধু স্বল্পোন্নত দেশগুলোর, কিছু শুধু দ্বীপরাষ্ট্রের ও ভূ-আবদ্ধ দেশের জন্য প্রযোজ্য]

লক্ষ্যমাত্রা ১৬

একটি মুক্ত, নিয়মভিত্তিক, নিশ্চিত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিও জড়িত

লক্ষ্যমাত্রা ১৭

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা

গ্রহণ। এর মধ্যে থাকবে : শুল্ক ও কোটামুক্ত রপ্তানির সুযোগ; গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত দেশের জন্য ঋণমুক্তি কার্যক্রম জোরদার ও দ্বিপক্ষীয় ঋণ অবলোপন করা; দারিদ্র্য দূরীকরণে স্বল্পোন্নত দেশকে অধিক পরিমাণে সরকারিভাবে বৈদেশিক সহায়তা প্রদান

সূচকসমূহ

ওডিএ (অফিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স বা সরকারিভাবে দেওয়া উন্নয়ন সহযোগিতা)

৪৫. ওডিএ-দানকারী দেশের মোট জাতীয় আয়ের কত শতাংশ নিট ওডিএ হিসেবে প্রদত্ত এবং কতখানি এলডিসিগুলোকে (স্বল্পোন্নত দেশসমূহ) প্রদত্ত

৪৬. ওডিএ-র কত অংশ মৌলিক সামাজিক সেবা খাতে (প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, সুপেয় পানি ও পয়োনিষ্কাশন) প্রদত্ত

৪৭. ওডিএ-র কত অংশ শর্তহীন

৪৮. ওডিএ-র কত অংশ ছোট উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রের জন্য প্রদত্ত

৪৯. ওডিএ-র কত অংশ ভূ-আবদ্ধ রাষ্ট্রের যোগাযোগ খাতে প্রদত্ত

বাজার-সুবিধা

৫০. উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশগুলোর মোট আমদানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত (অস্ত্র বাদে) আমদানির আনুপাতিক অংশ

৫১. কৃষি, বস্ত্র ও পোশাক-জাতীয় পণ্যের ওপর উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক আরোপকৃত গড় শুল্ক ও কোটা

৫২. ওইসিডিভুক্ত দেশের কৃষিপণ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে ও রপ্তানিতে প্রদত্ত ভর্তুকি

৫৩. ওডিএ-তে বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষমতা সৃষ্টির জন্য প্রদত্ত সম্পদের আনুপাতিক অংশ

লক্ষ্যমাত্রা ১৮

ভূ-আবদ্ধ এবং উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

লক্ষ্যমাত্রা ১৯

একটি লম্বা সময়ের নিরিখে উন্নয়নশীল দেশের ঋণের দায়ভার যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সেজন্য দেশজ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া

সূচকসমূহ

সহনীয় ঋণব্যবস্থা

৫৪. গভীরভাবে ঋণগ্রস্ত দেশের সরকারি ও দ্বিপক্ষীয়ভাবে প্রাপ্ত ঋণের বাতিলকৃত অংশ

৫৫. পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের কত ভাগ ঋণসেবায় (আসল ও সুদ প্রদান) ব্যয় হয়

৫৬. গভীর ঋণগ্রস্ত দেশের সংখ্যা

লক্ষ্যমাত্রা ২০

ওষুধ-শিল্পের সহযোগিতায়, উন্নয়নশীল দেশে ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি

সূচক

৫৭. ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ-সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার

লক্ষ্যমাত্রা ২১

ব্যক্তিমালিকানা খাতের সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগসহ অন্যান্য খাতে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বৃদ্ধি

সূচক

৫৮. প্রতি ১০০ জনে টেলিযোগাযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা

৫৯. প্রতি ১০০ জনে মোবাইল ফোন গ্রাহকের সংখ্যা

৬০. প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা

বাংলাদেশ : এমডিজি

- বাংলাদেশে এমডিজি নিয়ে যখন আমরা কাজ করব, তখন অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে উল্লিখিত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও সংশ্লিষ্ট সূচকগুলোর সব বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিছু লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক বাংলাদেশ মূল লক্ষ্যমাত্রার আলোকে পুনর্বিন্যাস করেছে। সরকারি দলিল ঘেঁটে আমরা এখানে 'বাংলাদেশের এমডিজি' শীর্ষক একটি সারণি প্রদান করেছি। সেই সারণি দেখলে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

- ইউএনডিপির সহযোগিতায় পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2008-এর ওপর ভিত্তি করে সারনিটি প্রস্তুতকৃত। এটি ২০০৯ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে অনেকগুলো সূচকের কোনো তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে এখানেও সেগুলো সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়া সম্ভব হলো না। এর আগে ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশ সরকারে ও বাংলাদেশে জাতিসংঘ টিমের যৌথ উদ্যোগে। সেই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক যা ছিল, তার ২০০৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কিছুটা পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে। আমরা সর্বশেষটিকেই বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক হিসেবে গণ্য করব।

বাংলাদেশের এমডিজি

লক্ষ্য ১ : চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা

লক্ষ্যমাত্রা ১: যাদের আয় দৈনিক ১ ডলারের কম, ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যায় তাদের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাসকরণ

সূচক	১৯৯০-৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. জাতীয়ভাবে উচ্চ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের আনুপাতিক অংশ	৫৬.৬%	৪০% (২০০০)	২৮.৭%	২৯%
২. দারিদ্র্য ব্যবধান অনুপাত	১৭%	৯% (২০০৫)	৩.৩%	৮%
৩. জাতীয় ব্যয়ে সবচেয়ে দরিদ্রের অংশ	৬.৫%	৫.৩% (২০০৫)	৪.৯%	--

লক্ষ্যমাত্রা ২ : পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান অর্জন এবং নারী ও যুবাসহ সবার জন্য মানসম্মত কাজ

সূচক	১৯৯০-৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৫. জনসংখ্যার অনুপাতে কর্মসংস্থানের হার	৪৮.৫%	৫৮.৫% (২০০৬)		--

লক্ষ্যমাত্রা ৩ : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মোট জনগোষ্ঠীতে ক্ষুধার্ত মানুষের আনুপাতিক অংশ অর্ধেকে হ্রাস

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৮. পাঁচ বছরের কম বয়সী (৬ মাস থেকে ৫৯ মাস) ওজনস্বল্পতায় আক্রান্ত শিশুদের হার	৬৬%	৪৭.৮% (২০০৫)	৩৬.৫%	৩৩%
৯. যারা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যও পায় না, জনগোষ্ঠীতে তাদের আনুপাতিক অংশ	২৮%	১৯.৫% (২০০৫)	১১.২%	১৪%

লক্ষ্য ২ : সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ৪ : ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলে-মেয়ে-নির্বিশেষে সব শিশু যাতে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম পূর্ণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা [প্রাথমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার ১৯৯২-এর ৭৩.৭% থেকে ২০১৫-এর মধ্যে ১০০% -এ উন্নীত করা]

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১০. প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকৃত ভর্তির অনুপাত	৬০.৫%	৯১.১% (২০০৭)	১০০%	১০০%
১১. প্রথম শ্রেণী ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনকারীদের অনুপাত	৪০.৭%	৫২% (২০০৭)	৬৪%	১০০%
১২. বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫ বছর বয়সের ওপরে)	৩৭.২%	৫৬.৩% (২০০৭)	৬৩%	--
১২.ক. বয়স্ক শিক্ষার হার (১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী নারী)	--	৬৯.৯% (২০০৭)	--	--

লক্ষ্য ৩ : নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন

লক্ষ্যমাত্রা ৫ : ২০০৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সব শিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১৩.ক. প্রাথমিক শিক্ষায় ছেলের তুলনায় মেয়ের অনুপাত	০.৮৩	১.০৮ (২০০৭)	--	১০০
১৩.খ. মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলের তুলনায় মেয়ের অনুপাত	০.৫২	১.০৮ (২০০৬)	--	১০০
১৩.গ. উচ্চশিক্ষায় ছেলের তুলনায় মেয়ের অনুপাত	০.৩৭	০.৬১ (২০০৬)	--	১০০
১৪. অকৃষি খাতে নারী শ্রমের অংশ	১৯.১%	১৪.৬% (২০০৫)	--	--
১৫. জাতীয় সংসদে নারী আসনের অংশ	১২.৭	১৯ (২০০৯)	--	৩৩

লক্ষ্য ৪ : শিশুমৃত্যু হ্রাস

লক্ষ্যমাত্রা ৬ : ২০১৫ সালের মধ্যে পাঁচ বছরের শিশুদের মৃত্যুহার দুই-তৃতীয়াংশে হ্রাস

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১৬. পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যু হার (হাজারে)	১৪৬	৬০ (২০০৭)	২৮	৪৮
১৭. এক বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু হার (হাজারে)	৯২	৪৩ (২০০৭)	১৭	৩১
১৮. এক বছর বয়সী হামের টিকা গ্রহণকারী শিশুর আনুপাতিক অংশ (%)	৫৪	৮৮ (২০০৬)	১০০	১০০

লক্ষ্য ৫ : মাতৃ-স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

লক্ষ্যমাত্রা ৭ : ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যুর হার তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
১৯. প্রসূতি মৃত্যুর হার (লাখে)	৫৭৪ (১৯৯০)	৫৭৪ (১৯৯০)	৩৫১	৩১৭
২০. জন্মের সময় দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর সেবা পাওয়ার আনুপাতিক হার	৫%	১৮% (২০০৭)	২৬.৯%	৫০% (২০১০)

লক্ষ্যমাত্রা ৮ : ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রজনন-স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
২১. জন্মনিরোধক ব্যবহার হার	৩৯.৭%	৫৯% (২০০৭)	৬৯.৪%	--
২২. কিশোরী মাতার (১৫ থেকে ১৯ বছর) হার (হাজারে)	৭৭	৫৯ (২০০৭)	৪৩	--

২৩. শিশু জন্মের আগে (গর্ভকালীন) মায়ের সেবা প্রাপ্তি (একবার)	২৭.৫% (১৯৯৩)	৬০.৩% (২০০৭)	৮৪.৫%	১০০
২৪. শিশু জন্মের আগে (গর্ভকালীন) মায়ের সেবা প্রাপ্তি (চারবার)	৫.৫% (১৯৯৩)	২০.৬% (২০০৭)	২৯.১%	১০০
২৫. পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজন পূরণের হার	১৯.৪% (১৯৯৩)	১৭.৬% (২০০৭)	১২.৫%	--

লক্ষ্য ৬ : এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগের মোকাবিলা

লক্ষ্যমাত্রা ৯ : ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-এর বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অবস্থা)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
২৫. জনগোষ্ঠীতে এইচআইভি সংক্রমণের হার (লাখে)	০.০০৫	০.৩১৯ (২০০৭)	১.৪	সংক্রমণ রোধ
২৬. জন্মনিরোধক (কনডম) ব্যবহারের হার	--	৪.৫% (২০০৭)	৫.৩%	--
২৭. এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে এমন সংখ্যা	--	১৫.৮% (২০০৬)	--	--

লক্ষ্যমাত্রা ১১ : ২০১৫ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়াসহ অন্য প্রধান রোগের বিস্তার রোধ এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অবস্থা)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৩০.ক. ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা লাখে)	৪৩ (২০০০)	৫৮.৬ (২০০৮)	২২	রোধ করা
৩০.খ. ম্যালেরিয়াজনিত মৃত্যুহার (লাখে)	০.৩৭ (২০০০)	০.১১ (২০০৮)	০.০৫	রোধ করা
৩১. মশারির মধ্যে ঘুমায় পাঁচ বছরের কম বয়সী এমন শিশুর আনুপাতিক হার (ম্যালেরিয়া-প্রবণ ১৩ জেলায়)	--	৮৯% (২০০৮)	৯০%	--
৩২. জ্বরাক্রান্ত পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু যারা যথাযথ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক পায় (ম্যালেরিয়া-প্রবণ ১৩ জেলায়)	--	পর্যাপ্ত তথ্য নেই	--	--
৩৩.ক. যক্ষ্মায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা (লাখে)	২৬৪ (১৯৯০)	২২৫ (২০০৭)	২০৯	রোধ করে উল্টোযাত্রা

৩৩.খ. যক্ষ্মারোগজনিত মৃত্যু হার (লাখে)	৭৬ (১৯৯০)	৪৫ (২০০৭)	৩৬	অর্ধেকে নামানো
৩৪.ক. সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্বল্পকালীন চিকিৎসা প্রাপ্তির সাহায্যে সন্ধানকৃত যক্ষ্মারোগী (লাখে)	২১ (১৯৯৪)	৭৩ (২০০৭)	--	ধরে রাখা
৩৪.খ. সরাসরি তত্ত্বাবধানে স্বল্পকালীন চিকিৎসা প্রাপ্ত যক্ষ্মারোগীর আনুপাতিক হার (লাখে)	৭৩ (১৯৯৪)	৯১ (২০০৬)	--	ধরে রাখা

লক্ষ্য ৭ : টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা

লক্ষ্যমাত্রা ১২ : জাতীয় পর্যায়ে নীতি ও কার্যক্রমে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা অঙ্গীভূত করা এবং পরিবেশ সম্পদের ক্ষয়রোধ

লক্ষ্যমাত্রা ১৩ : জৈব বৈচিত্র্য ক্ষয়রোধ ও ২০১০ সালের মধ্যে ক্ষয় উল্লেখযোগ্য হারে কমানো

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অর্জন	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৩৫. দেশের আয়তনে বনভূমির (গাছের) আনুপাতিক হার	৯%	১৯.২% (২০০৭)	২০%	২০% (গাছের ঘনত্ব ৭০%)
৩৬. মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ (মে. টনে)	০.১৪	০.৩০ (২০০৭)	০.৩৮	নিম্ন নির্গমন
৩৭. ওজোনস্তর ক্ষয়কারী সামগ্রীর ব্যবহার (মে. টনে)	১৯৫	১৫৫ (২০০৭)	০	০
৩৮. মৎস্যসম্পদের মজুদ নিরাপদ জৈবসীমায় রাখার আনুপাতিক হার	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই
৩৯. ব্যবহৃত মোট পানিসম্পদের আনুপাতিক হার	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই
৪০. সংরক্ষিত উপকূল ও জলাভূমি	১.৬৪	১.৬৮ (২০০৭)	১.৭০	৫

৪১. হুমকির মুখে থাকা প্রজাতির আনুপাতিক হার	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই	তথ্য নেই

লক্ষ্যমাত্রা ১৪ : নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগহীন জনসংখ্যার আনুপাতিক হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে হ্রাস

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অবস্থা)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৪২. নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি সংগ্রহের সুযোগ প্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার	৮৯%	৯৭.৮% (২০০৭)	৯৮.২%	১০০%
৪৩. উন্নততর পয়োনিষ্কাশনের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের আনুপাতিক হার	২১%	৩৯.২% (২০০৬)	৫১.৩%	৬০%

লক্ষ্যমাত্রা ১৫ : ২০২০ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১০ কোটি বস্তিবাসীর জীবনমান লক্ষণীয়ভাবে উন্নত করা

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অবস্থা)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৪৪. নগরবাসীর মধ্যে বস্তিবাসীর আনুপাতিক হার	--	৭.৮ (২০০১)	পর্যাপ্ত তথ্য নেই	--

লক্ষ্য ৮ : উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা

লক্ষ্যমাত্রা ১৬ : একটি মুক্ত, নিয়মভিত্তিক, নিশ্চিত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেখানে সুশাসন, উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকল্পও জড়িত

লক্ষ্যমাত্রা ১৭ : স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

লক্ষ্যমাত্রা ১৮ : উপকূলহীন এবং উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গ্রহণ

লক্ষ্যমাত্রা ১৯ : একটি লম্বা সময়ের নিরিখে উন্নয়নশীল দেশের ঋণ দায়ভার যেন সহনীয় পর্যায়ে থাকে, সেজন্য দেশজ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবস্থা নেওয়া

সূচক	১৯৯০	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অর্জন)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৪৫.ক. বাংলাদেশ কর্তৃক প্রাপ্ত নিট ওডিএ (কোটি ডলারে)	১২৪ (৮৯–৯০)	৯৬.১ (২০০৭-০৮)	--	--
৪৫.খ বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ওডিএ, ওইসিডি/ডিএসি (দাতা দেশগুলোর জাতীয় আয়ের অংশ)	৫.৭%	০.২% (২০০৬)	--	--

৪৬. ওডিএর কত অংশ দ্বিপাক্ষিকভাবে মৌলিক সামাজিক সেবা খাতে প্রদত্ত	--	৪২% (২০০৫)	--	--
৪৭. কৃষি, বস্ত্র ও পোশাক পণ্যের ওপর উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক আরোপকৃত গড় শুল্ক ও কোটা	--	১২%-১৬% (২০০৬)	--	--
৫৫. পণ্য ও সেবা রপ্তানি আয়ের কত ভাগ ঋণসেবায় (আসল ও সুদ প্রদান) ব্যয় হয়	২০.৯%	৭.৯% (২০০৭)	--	--

ব্যক্তি-মালিকানা খাতের সহযোগিতায় তথ্য ও যোগাযোগসহ অন্যান্য খাতে নতুন প্রযুক্তির সুবিধা বৃদ্ধি

সূচক	১৯৯১	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ (অনুমিত অবস্থা)	২০১৫ (লক্ষ্যমাত্রা)
৫৮. প্রতি ১০০ জনে টেলিযোগাযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	০.২	০.৯২ (২০০৮)	--	--
৫৯. প্রতি ১০০ জনে মোবাইল ফোন গ্রাহককের সংখ্যা	০.০	৩০.৮ (২০০৮)	--	--
৬০. প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা	০.০	৩.৪ (২০০৮)	--	--

বাংলাদেশের জন্য লক্ষ্য ৮-এর অন্তর্গত ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৬ ও ৫৭ নম্বর সূচক প্রযোজ্য ধরা হয়নি।

এ ছাড়া ১ম লক্ষ্যের ৪, ৬ ও ৭ নম্বর সূচক এবং ৬ষ্ঠ লক্ষ্যের ২৮ ও ২৯ নম্বর সূচক বিষয়ে কোনো তথ্য নেই বা প্রযোজ্য নয়।

এমডিজির সরলপাঠ

এমডিজির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ওপরে আমরা যখন লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ উপস্থাপন করেছি, তখনই বিভিন্ন বিষয় একটু বিস্তারিত বোঝার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এখানে সে বিষয়গুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হলো।

পিপিপি নিয়ে প্রশ্ন

- পিপিপি হলো পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি বা ক্রয়ক্ষমতার সমতা। প্রথম লক্ষ্যের প্রথম লক্ষ্যমাত্রার প্রথম সূচকটি হলো পিপিপিতে দৈনিক ১ ডলারের কম—এমন জনগোষ্ঠীর শতকরা হারকে নির্ণয় করতে হবে। এখন এই ক্রয়ক্ষমতার সমতা (পিপিপি) হলো কোনো দেশের মুদ্রামানের এমন একটি মূল্য নির্ধারণ, যা চলতি বাজার মূল্য থেকে আলাদা। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে এক মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। এতে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে এক মার্কিন ডলার দিয়ে আমেরিকায় যে পণ্য-সেবা ক্রয় করা সম্ভব, তা ক্রয় করতে বাংলাদেশে আসলে কত টাকা বা ভারতে আসলে কত রুপি ব্যয় করতে হবে। ধরি, আমেরিকায় এক কেজি আটার দাম চার ডলার। আর বাংলাদেশে এক কেজি আটার দাম ৩০ টাকা। এই হিসেবে পিপিপি অনুসারে চার ডলার = ৩০ টাকা; মানে এক পিপিপি ডলার হবে বাংলাদেশি মুদ্রামানে সাড়ে সাত টাকা।

- প্রথম অবস্থায় বাংলাদেশ এমডিজির এই সূচক অনুসরণ শুরু করেছিল। সে সময় বাংলাদেশের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল মোট জনগোষ্ঠীতে মাথাপিছু ১ পিপিপি ডলারের কম আয় করে, এমন মানুষের অংশ ১৯৯১ সালের

৫৮.৮% থেকে ২০১৫ সালে ২৯.৪%-এ নামিয়ে আনা। পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে পিপিপি হিসাব করতে সমস্যা হচ্ছে। পিপিপির হিসাব বাস্তবসম্মত হচ্ছে না। আর বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপে মাথাপিছু ক্যালোরি গ্রহণ-পদ্ধতি অধিক সুবিধাজনক ও বাস্তবসম্মত। সুতরাং, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের অংশ ১৯৯০ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করল বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালোরি গ্রহণকে দারিদ্র্যের উচ্চসীমা ধরে এর নিচে অবস্থানকারী মানুষের অংশকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনার কথা বলা হলো। ১৯৯০-৯১ সময়কালকে ধরা হলো ভিত্তি-বছর। তখন দারিদ্র্যের উচ্চসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৫৬.৬%; আর এখন তা ৪০%। অবশ্য এটি ২০০৫ সালের হিসাব। এর পর এখন পর্যন্ত এটি আর হালনাগাদ করা হয়নি। তবে যে অনুমিত হিসাব করা হয়েছে তাতে এই হার ২০০৮ সালে ৩৭%। ২০১৫ সালে এটি ৩০%-এর নিচে নামিয়ে আনতে হবে।

দারিদ্র্য-ব্যবধানের অনুপাত

এটি একটি জটিল পরিমাপক। সহজভাবে বললে এর মাধ্যমে গরিব মানুষের গড় আয় ও দারিদ্র্যসীমার মধ্যকার ব্যবধান মাপা হয়। তার মানে এটি হলো দারিদ্র্যের গভীরতা। ১৯৯১ সালে দারিদ্র্য-ব্যবধান অনুপাত ছিল ১৭%, যা ২০০৫ সালে কমে হয়েছে ৯%। এটি একটি বড় অগ্রগতি। কারণ, ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ এই হার ৮%-এ নামিয়ে আনতে চায়।

মানসম্মত কাজ (ডিসেন্ট জব)

মানসম্মত কাজ হলো সেই ধরনের উৎপাদনশীল কাজ, যা পর্যাপ্ত আয়ের সুযোগ কর দেয়। প্রতিকূল অবস্থায় এই কাজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং কাজের ভালো পরিবেশ তৈরি করে। সবচেয়ে বড় কথা, এই কাজ গরিব মানুষকে ক্রমান্বয়ে গরিবি থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করে।

ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য

ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের পরিসংখ্যান চরম দারিদ্র্যের অবস্থা বুঝতে সহায়তা করে। দৈনিক ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণ করে, এমন মানুষই বাংলাদেশে চরমভাবে দরিদ্র বলে পরিগণিত হয়। ১৯৯০-৯১ সময়কালে মোট জনগোষ্ঠীতে এই হার ছিল ২৮%, যা বর্তমানে (২০০৫) ১৯.৫%। ২০১৫ সালে এই হার ১৪%-এ নামিয়ে আনতে হবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্য পরিমাপ

- বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (বিবিএস) দুই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। একটি হলো: প্রত্যক্ষ ক্যালোরি গ্রহণ (ডিসিআই); অন্যটি মৌলিক চাহিদা ব্যয় (সিবিএন)।

- ডিসিআই পদ্ধতিতে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলো ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ হলো দারিদ্র্যসীমা। এর মানে হলো একজন মানুষ প্রতিদিন অন্তত এই পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করলে তা তার জন্য মানসম্মত পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে। আর এই পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষমতা না থাকলে তা তার পুষ্টির ঘাটতি তৈরি করে, তাকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। ২১২২ কিলো ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণকারীদের বাংলাদেশে অনপেক্ষ দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত করা

হয়। সহজভাবে বললে, এরা গরিব। আর ১৮০৫ কিলো ক্যালোরির কম খাদ্য গ্রহণকারীরা চরম দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত। সহজভাবে বললে এরা বেশি গরিব। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হলো এটি প্রকৃতপক্ষে পুষ্টির অবস্থা নির্ণয় করে। এখানে অন্য কল্যাণমূলক বিষয়গুলো না থাকায় দারিদ্র্য পরিমাপের গণ্ডি সীমিত হয়ে পড়ে।

- অন্যদিকে মৌলিক চাহিদা ব্যয় (সিবিএন) পদ্ধতিতে খাদ্যের পাশাপাশি খাদ্যবহির্ভূত ভোগ্য পণ্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এর হিসাব-পদ্ধতিটি বেশ জটিল। এ ছাড়া খাদ্যশক্তি গ্রহণ (এফইআই) নামে আরেকটি পদ্ধতি আছে যা বাংলাদেশে বহুদিন ব্যবহৃত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণের (কিলো ক্যালোরি) সঙ্গে ব্যয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

- এমডিজির দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। এর মানে হলো বিদ্যালয়ে যাওয়ার যোগ্য বা স্কুলের বয়সী সব শিশু যেন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায় এবং শিক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করে। এই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব শিশু যেন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে তা নিশ্চিত করা।
- এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ দুটো লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। একটি হলো : প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকৃত ভর্তির হার ১৯৯২-এর ৭৩.৭% থেকে ২০১৫-এর মধ্যে ১০০%-এ উন্নীত করা; অপরটি প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার ১৯৯৪-এর ৩৮% থেকে কমিয়ে ২০১৫-এর মধ্যে শূন্যভাগে নামিয়ে আনা। সরকারি দলিল থেকে দেখা যায়, নিট ভর্তির হার ২০০৭ সালে ৯১.১%-এ

উন্নীত হয়েছে। এবং ২০১৫ সালের মধ্যে তা শতভাগে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের বিষয়টিকে বোঝানো হয়ছে।

- তবে মনে রাখা দরকার যে শুধু বিদ্যালয়ে যাওয়াই নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়ে মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করাও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে থেমে পড়লে তা হয়তো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নয়, কিন্তু দেশের শিক্ষা কার্যক্রমে অগ্রগতির ক্ষেত্রে সুখকর নয়।

শিশুমৃত্যু নিয়ে ভাবনা

- আমরা সবাই দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবন কামনা করি। এবং সেটা আমরা পাব। ১৯৭০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত আমাদের গড় আয়ু ১৫ বছর পর্যন্ত বেড়েছে। বাংলাদেশে এখন গড় আয়ু ৬৩ বছর। এ বয়সকেই আমরা সুস্থতার মাপকাঠি ধরে নিই। কিন্তু এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো : শিশুমৃত্যুর হার, বিশেষত নবজাতকের (এক বছরের কম বয়সী শিশু) মৃত্যু ঠেকানো। কেননা, এরা অনেক বেশি অসুস্থতার মুখোমুখি হয়। সে কারণে চতুর্থ এমডিজিতে শিশুমৃত্যুর হার কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

- বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ১৯৯০ সালে যে অবস্থা ছিল, ২০১৫ সালের মধ্যে তা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করতে হবে। এর মানে হলো পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ৪৮ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৯২ থেকে ৩১-এ নামিয়ে আনতে হবে। এবং এক বছর বয়সী শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি ৫৩% থেকে ১০০%-এ উন্নীত করতে হবে।

- বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যুহার কমলেও তা পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মৃত্যু হার কমার চেয়ে ধীর গতিতে কমছে। ১৯৯০-৯১ সালে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৪৬ থেকে ২০০৭ সালে প্রতি হাজারে ৬০ জনে নেমেছে। একই সময়কালে নবজাতক মৃত্যুর হার হাজারে ৯২ থেকে ৪৩ হয়েছে।

- এখনো অনেক শিশু যে বেঁচে যাচ্ছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হলো দারিদ্র্য হার হ্রাস পাওয়া। এর মানে হলো শিশুরা তুলনামূলক সহনীয় এবং সুস্থ পরিবেশে বেড়ে উঠছে। শিশুর সুস্থভাবে টিকে থাকার জন্য এখন আমাদের তুলনামূলক ভালো জায়গায় যেতে হবে। কেননা সমাজের দরিদ্র অংশে শিশুমৃত্যু হার বেশি।

- বর্তমানে বেশিরভাগ শিশুকেই টিকার অধীনে নেওয়া গেছে। তবে শতভাগ নিশ্চিত করা যায়নি। টিকা নেওয়ার বিষয়টা অভিভাবকদের ওপর নির্ভর করে বটে। কিন্তু একটা সুসংগঠিত স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়ারই প্রয়োজন আছে। গরিব মানুষ সরকারি সেবা-ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করায় তাদের অনেক বেশি ভুগতে হয়। সম্প্রতি দেখা গেছে, স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের বরাদ্দ মোট বরাদ্দের ৪% থেকে ১১% পর্যন্ত হয়েছে। তবে এই বরাদ্দের ৪০% যায় হাসপাতাল-কর্মীদের বেতন-ভাতার পেছনে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মোট বরাদ্দকে বাজেটের ১৫%-এ উন্নীত করার কথা বলেছে। ফলে আরও অর্থায়ন প্রয়োজন। অর্থের যোগান বাড়ানোর মাধ্যমে পরিস্থিতি পাল্টানোর সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

- মনে রাখা দরকার যে শুধু অসুখ সারা নয়, অসুখ প্রতিরোধ করাও অনেক জরুরি। শুধু প্রথম বছরের শিশুমৃত্যু নয়, প্রথম সপ্তাহেই শিশুমৃত্যু বেড়ে যাওয়া রোধ করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যার মানে নিরাপদ প্রসব এবং প্রসব-পরবর্তী সময়ে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের গুণগত মান

বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলে তারা যদি এই সময়টায় কোনো ইনফেকশন (সংক্রমণ) ও ডায়রিয়ার সম্মুখীন হয়, তাহলে তা থেকে রক্ষা পাবে। বস্তুত সংক্রমণ বা ডায়রিয়া দুই-ই প্রতিরোধ করা সম্ভব, যদি শুরু থেকেই যত্ন নেওয়া যায়। আর সার্বিকভাবে সুস্থ শিশুর শারীরিক পরিস্থিতি তার মায়ের সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল, যা আমাদের পরের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যকে নির্দেশ করে।

মায়ের জন্য করণীয়

- শিশুর সঙ্গে মায়ের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মাতৃস্বাস্থ্যের বা প্রসূতি-স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের হিসাবেই দেখা গেছে, প্রসবকালে প্রতিবছর গড়ে ২০ হাজার নারীর মৃত্যু ঘটে। আনন্দের বিষয়টি বেদনায় রূপান্তরিত হয়। এ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব। আর এ কারণে এমডিজির পঞ্চম বিষয় হলো মাতৃস্বাস্থ্য।

- বাংলাদেশ সরকার এ ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে, সেগুলোর মধ্যে আছে : প্রসবজনিত মাতৃমৃত্যু ১৯৯০ সালের প্রতি লাখে ৫৭৪ থেকে কমিয়ে ২০১৫ সালে ১৪৪-এ নামিয়ে আনা এবং প্রসবকালে অভিজ্ঞ সেবাকর্মীর উপস্থিতি ৫% থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০% বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া মোট প্রজনন হার (TFR) ২.২%-এ নামিয়ে আনা, মাতৃত্বকালীন অযত্ন ও অপুষ্টির হার ৪৫% থেকে কমিয়ে ২০% করা, নারী বিবাহের আইনগত বয়স পুনর্নির্ধারণ (২০ বছর) করা এবং সহিংসতাজনিত কারণে নারীমৃত্যুর হার ১৪% থেকে কমিয়ে শূন্যতে নিয়ে আসার কথাও বলা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এমডিজিতে নতুন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক যোগ করা হলে বাংলাদেশের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রায় শেষ চারটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

মাতৃমৃত্যুর কারণ

- মাতৃমৃত্যুর হার যে বেশি, সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। তবে এর সঠিক সংখ্যা নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। একইভাবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিতর্ক আছে। সাধারণত যে পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তা হলো নারীদের জিজ্ঞেস করা হয় যে তাদের বোনদের কেউ সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেছে কি না। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে মাতৃমৃত্যুর কারণগুলো খুব জটিল নয়। বেশিরভাগ জন্ম সাধারণভাবেই হয়। কিন্তু কখনো কখনো খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। কখনো কখনো রক্তক্ষরণ ঘটতে পারে।

- সমস্যা হলো শিশুজন্ম এতটাই স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত যে যেকোনো ধরনের জটিল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এসব জটিলতার অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। গর্ভপাতের কারণে যে মৃত্যু ঘটে সেটা যথাযথ জন্মনিরোধক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব। বর্তমানে ১৫ থেকে ২৪ বছরের নারীদের অর্ধেক আধুনিক জন্মনিরোধক পদ্ধতি মেনে চলেন। সবচেয়ে বেশিসংখ্যক নারী ব্যবহার করেন জন্মনিরোধক বড়ি। ১৫ থেকে ৪৯ বছরের নারীর মধ্যে এই জন্মনিরোধক প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে।

প্রসবকালীন সমস্যা

- প্রসবজনিত সমস্যা সারা দুনিয়াতেই আছে। গরিব দেশগুলোতে এর মাত্রা বেশি। সে কারণেই এমডিজিতে মাতৃমৃত্যুর সঙ্গে প্রসবের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতির কথা। বিশেষ করে, বাসাবাড়িতে প্রসবকালে মায়ের জন্য দক্ষ দাই বা জন্মসেবিকা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগ মা এ ধরনের সহযোগিতা পায় না। আর তা না পাওয়ার মূল কারণ হলো যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকা নেই।

যদিও অনেক নারীকে প্রসব প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়। তার পরও নানা ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর অসহযোগিতায় এদেরকে ঠিকমতো কাজে লাগানো যায় না।

- আরেকটি প্রশ্ন এখানে চলে আসে। সেটি হলো : কেন পরিবারগুলো এখনো সেই সনাতন পদ্ধতির প্রসব ব্যবস্থাকেই গুরুত্ব দেয়? উত্তরটা হলো : কম খরচে দাই পাওয়া। তা ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য এবং পরিচিত কারোর মাধ্যমে প্রসব করানো গেলে পরিবারের মানুষ স্বস্তি পায়। তারা মনে করে, এদের যেকোনো প্রয়োজনে কাছে পাওয়া যাবে এবং তারা একটু মনোযোগ দেয় বলেও পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করে। স্বাভাবিক প্রসবকালে এসব সত্য হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহলে তারা তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। বিশেষত, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিবহন ও যোগাযোগের ব্যাপক সমস্যা আছে। ধর্মীয় রক্ষণশীলতাও একটি কারণ।

- বস্তুত ধনী বা গরিব, শহর বা গ্রাম—যেখানেই হোক, গর্ভকালে বা প্রসবকালে জটিলতা হতেই পারে। ফলে সব জন্মের ক্ষেত্রেই আমাদের জরুরি নজর দেওয়া এবং যেকোনো জটিলতার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। প্রয়োজন হলে দ্রুত যেন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে পৌঁছানো যায়, সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বলে, মাতৃমৃত্যুর অর্ধেকই কমিয়ে আনা যায় কেবল দক্ষ প্রসব-সহায়তাকারীর সাহায্য নিলে।

- এমডিজির এই লক্ষ্য নির্ধারণ থেকে আরেকটি প্রশ্ন এসেছে—সব জন্মই জটিল কি না। সব জন্মই জটিল নয়, তবে জরুরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। পাশের কোনো ব্যক্তি যদি জরুরি পরিস্থিতির

সম্ভাবনাটা আগেই বুঝতে পারে, তাহলে সেটা ভালো। যদি জন্মের সময় দক্ষ কেউ থাকে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে গিয়ে যদি প্রসব করে তবে চিকিৎসক ও সেবিকারা যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। যদি আমরা মাতৃস্বাস্থ্য-সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে চাই, তাহলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মান বাড়াতে হবে। সুতরাং যাঁরা এমডিজির এই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তবতা নিয়ে জানতে ও প্রতিবেদন তৈরি করতে চান, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সম্পর্কে তাঁদের ধারণা নিতে হবে।

এইডসের ভয়াবহতা

- এমডিজির ষষ্ঠ লক্ষ্যতে অনেক জটিল সংক্রামকের বিষয়ে বলা হলেও শুরুতেই এইচআইভি/এইডস-এর কথা রয়েছে। এটা শুধু জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়বাহ পরিণতি ডেকে আনে তা নয়, দেশের জন্যও ক্ষতিকর। দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এটা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গণমাধ্যম ও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে স্বাস্থ্যশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত, যৌনকর্মী, হিজড়াদের মধ্যে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। তবে সঠিক হিসাব দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি।

- এইচআইভি/এইডস-এর আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে শঙ্কা করা হচ্ছে। যারা সুইয়ের মাধ্যমে মাদক নেয় এবং যারা যৌনকর্মী তাদেরই বেশি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বলে ধারণা করা হয়। তাদের থেকে এই ভাইরাস অন্যদের ভেতরে ছড়িয়ে মহামারী আকার নিতে পারে। তবে বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু সরকারি পরিসংখ্যানেই দেখা যায় যে সংক্রমণ হওয়ার হার বাড়ছে। ১৯৯০-৯১ সময়কালে প্রতি লাখে ০.০০৫ জন আক্রান্ত হলেও ২০০৭ সালে প্রতি লাখে ০.৩২ জন

আক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং, এইডস প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

জানা-বোঝার ঘাটতি

- জানা থাকা প্রয়োজন যে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এটা ভয়াবহ সংক্রামক। তবে এটা স্বাভাবিক যোগাযোগে ছড়ায় না। এইচআইভি পজিটিভ কারো সঙ্গে মিশলে ও বাস করলেই এইচআইভি পজিটিভ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ছোঁয়া লাগলে, এমনকি চুমু খেলেও এটা হয় না। এইচআইভি নিয়ে ভীতি তৈরি হওয়ার প্রধান কারণ, এটা কীভাবে ছড়ায় সে সম্পর্কে সাধারণ জনগণ খুবই কম জানে।

- এটা ছড়ায় রক্তের মাধ্যমে এবং অনিরাপদ যৌন সম্পর্কের কারণে। মাদকগ্রহীতারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে, কারণ তারা প্রায়শই একই সুই ব্যবহার করে। ফলে এক ব্যক্তির কাছ থেকে সহজে ভাইরাস ছড়িয়ে যায়। গর্ভবতী এইচআইভি পজিটিভ মা রক্তের মাধ্যমে সদ্যোজাত সন্তানের ভেতরেও ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে পারে। কনডমের কম ব্যবহারের বিষয়টি সবচেয়ে ক্ষতিকর। সে কারণে এইচআইভি ব্যাপক আকারে ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

- সুতরাং সবার আগে বিষয়টি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য জানা থাকতে হবে। অনেকে এ রোগ সম্পর্কে সচেতন কিন্তু অনেক ভুল ধারণা নিয়ে তারা সচেতন। একাধিক জরিপ থেকে দেখা যায় যে প্রাপ্তবয়স্ক কিছু যুবক-যুবতীর উল্লেখযোগ্য অংশই জানে না এইডস কীভাবে ছড়ায়। আবার কেউ কেউ কনডম কিনতে অস্বস্তি বোধ করে বলে ব্যবহার করে না। আবার বেশিরভাগই জানে না, তারা এইচআইভি পজিটিভ কি না। ফলে এটাও গুরুত্বপূর্ণ, সবাই যেন পরীক্ষা করতে পারে সে সুযোগ তৈরি করে দিতে

হবে। যদি কেউ জানে সে এইচআইভি পজিটিভ তাহলে সে তার সঙ্গীর সামনেও সেটা স্বীকার করে না, এটা করা উচিত। প্রতিষেধক না থাকলেও অ্যান্টি রিট্রোভাইরাল নামে ওষুধ আছে, যা এ রোগকে ভয়াবহতার দিকে যেতে দেয় না। এটা বিনামূল্যে দেওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে কেবল শহরের সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন সংস্থা এইচআইভি পজিটিভদের নিয়ে বেশকিছু কর্মসূচি এবং ওষুধের মাধ্যমে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করছে। বস্তুত এইচআইভি-এইডস রোগ প্রতিরোধের জন্য এর মূল তথ্যগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করা দরকার।

ম্যালেরিয়ার বিস্তার

- ম্যালেরিয়া রোগের ক্ষেত্রে একটি বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সচেতন থাকলে এ রোগে মারা যাওয়ার আশঙ্কা নাই। শিশু ও গর্ভবতী নারীদের বিষয়টি অবশ্য ভিন্ন। শুধু ম্যালেরিয়া নয়, বরং যেকোনো অসুখের ক্ষেত্রে এই দুই ধরনের মানুষকে রক্ষা করতে বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

- কিন্তু পুরো পরিস্থিতির চিত্র পাওয়ার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের সামনে নেই। ফলে এটাও প্রতিবেদন তৈরির একটা বিষয় হতে পারে। যারা ম্যালেরিয়ার কারণে মারা যায় তাদের ২০% চিকিৎসা নিতে আসে। বাংলাদেশে ৮৪ জেলার মধ্যে ১৩টি জেলাকে ঝুঁকিপূর্ণ ধরা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ম্যালেরিয়া আক্রান্তের ১৮% এই কটি জেলা থেকে। ২০০৭ সালে ৫৬৩৪ জনের মধ্যে ২৩৯ জনের মৃত্যু ঘটেছে—প্রতি লাখে ৪৭২ জন। ২০০২ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ছিল। ২০০২ সালে ১২৮২ এবং ২০০৭ সালে সেটা ৫৩৭ জনে নেমেছে। এই ধারায় চলতে থাকলে এমজিডি লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া কঠিন হবে।

- এই অবস্থায় প্রথম কাজ হলো সংক্রামক প্রতিরোধ। এজন্য এনোফিলিস মশা নিধনের কাজকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে মশার বংশবিস্তারের জায়গাগুলো কমানো। তারপর ঘরে মশার আক্রমণের পথ বন্ধ করা। বিশেষত শিশুদের জন্য মশারির ব্যবহার বাড়ানো জরুরি।

প্রতিরোধ আগে

- রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বাজেট থেকে কিছু টাকা আসে। এইডস, টিবি ও ম্যালেরিয়ার জন্য বিশ্বের বেশকিছু সংগঠন অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের নিজেদের উদ্যোগে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। এজন্য নিজস্ব উদ্যোগে ব্যয়ও করতে হবে। গরিব মানুষ যেহেতু নিজেরা তেমন একটা অর্থ ব্যয় করতে পারে না, সেহেতু তারাই ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগের সবচেয়ে বেশি শিকার। তাদের জীবন যাপনের মান নিচু, তারা অনেকেই ঠিকমতো মশারি ব্যবহার করতে পারে না এবং মশক নিধনের অন্য পদ্ধতিগুলোর সুবিধা পায় না। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে অনেক মানুষকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে হয়। কেউ কেউ জীবন চালানোর জন্য স্থান ত্যাগ করে। সবার জন্যই প্রথম অগ্রাধিকারে তাই প্রতিরোধের বিষয়টিকেই আনতে হবে। পাশাপাশি চিকিৎসা-ব্যবস্থা তো থাকবেই।

- মনে রাখা দরকার যে যদি কেউই আক্রান্ত না হয়, তাহলে বহনের জন্য মশা দূষিত রক্ত পাবে না। ফলে সংক্রমণের চক্র সেখানেই থেমে যাবে। ফলত ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চূড়ান্ত ধাপ হলো—একেবারে বিলুপ্ত করা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আক্রান্তদের আসার অপেক্ষা না করে স্বাস্থ্যকর্মীদের উচিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা তৈরি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। অন্যান্য সংক্রামক অসুখের মতোই

ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা অধিকতর স্বাস্থ্যকর প্রকৃতি এবং মানব-পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নিতে পারি। এটা আমাদের এমডিজির সপ্তম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবে।

টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ

- বাংলাদেশের উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশের, বিশেষত প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ধরনের ক্ষয়সাধন হয়ে চলছে। অনেকে বিষয়টাকে আরও রূঢ়ভাবে বলেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে আমরা যান্ত্রিক উন্নতি করছি। আমরা গাছপালা কেটে ফেলছি, জমির উর্বরতা নষ্ট করছি, কৃষিজমি কমিয়ে ফেলছি, নদীগুলো প্রতিনিয়ত দূষিত করে চলেছি। সপ্তম এমডিজি এসব ধ্বংস রুখতে এগিয়ে এসেছে।

- এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো আমাদের মোট ভূমির কতখানি গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত; সহজ করে বললে, মোট ভূমির কতখানি বনভূমি। ১৯৯০-৯১ সময়কালে বাংলাদেশের মোট ভূমির ৯% ছিল বনভূমি। ২০১৫ সালে এই হার বাড়িয়ে ২০% করার কথা। সরকারি দলিল ঘাঁটতে গিয়ে আমরা একটি মজার বিষয় জানতে পারলাম। ২০০৫ সালে প্রকাশিত দলিলে দেখানো হয়েছে যে ২০০০–২০০২ সময়কালে এই হার সামান্য বেড়ে হয়েছে মাত্র ১০.২%। আর ২০০৯ সালে প্রকাশিত হালনাগাদ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে ২০০৭ সালে এই হার বেড়ে হয়েছে ১৯.২%। এত অল্প সময়ে এতখানি অগ্রগতি কীভাবে হলো তা কিছুটা বিস্ময়করই বটে। এই সময়কালের মধ্যে কতখানি বনায়ন হয়েছে তা পর্যালোচনার দাবি রাখে।

বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

- এমডিজির শেষ লক্ষ্যটি হলো বিশ্বজুড়ে পরস্পরের মধ্যে অংশীদারিত্ব বাড়ানো। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বাড়ানো না গেলে এমডিজি অর্জন দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে—এই ধারণাকে বিবেচনায় নিয়েই এই লক্ষ্যটি নির্ধারণ করা হয়েছে। কেননা, ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে গরিব দেশগুলোর সহায়তা পাওয়ার দাবিটি দীর্ঘদিনের। বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের লক্ষ্য নির্ধারণের মধ্য দিয়ে এই দাবির প্রতি কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যের অধীনে যেসব লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে, সেসবের বেশিরভাগই উন্নত দেশগুলোর করণীয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক ঋণ ও বিদেশি সাহায্যের বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

- তার মানে আবার এই না যে, গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলো কিছুই করবে না; তাদেরও করণীয় আছে। তারা পরস্পরকে সহায়তা করতে পারে। এমনকি অধিকতর গরিব দেশগুলোকে তুলনামূলক কম গরিব দেশ কিছু সহযোগিতা দিতে পারে। এভাবে একটি সমন্বিত সহায়তা প্রয়াস এমডিজির মূল চেতনাকে বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

- অষ্টম লক্ষ্যের মূল বিষয়টি হলো, কীভাবে ধনী দেশগুলোর বিভিন্ন নীতি আমাদের মতো গরিব দেশগুলোকে প্রভাবিত করে থাকে। যেমন ধরা যাক বাণিজ্যের কথা। এর একটি দিক হলো রপ্তানি, আরেকটি হলো আমদানি। এখন বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিবছরই কিছু হারে বাড়ছে। রপ্তানি বাড়ার মানে হলো রপ্তানিযোগ্য পণ্য প্রস্তুত বা উৎপাদন বাড়ানো। আর উৎপাদন বাড়ানোর মানে হলো মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হওয়া। এভাবে যত বেশি মানুষ কাজ

পাবে, কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে, তত তার দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ তৈরি হবে। সে কারণেই আমরা রপ্তানি বাড়াতে চাই। উন্নত দেশের রপ্তানি বাজারে আরও বেশি করে প্রবেশ করতে চাই।

শুল্কারোপে বৈষম্য

- আমরা জানি, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি-পণ্য হলো তৈরি পোশাক। আবার তৈরি পোশাকের বিরাট একটি বাজার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে গড়ে ১৫ শতাংশ হারে শুল্ক দিতে হয়। এই উচ্চহারে শুল্ক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। আর এই শুল্কারোপ নিয়ে আমেরিকা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করে চলেছে। ২০০৬ সালে আমেরিকায় বাংলাদেশি পণ্যের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৩০ কোটি ডলার। এর বিপরীতে বাংলাদেশকে শুল্ক দিতে হয়েছে প্রায় ৪৯ কোটি ডলার। আরেক স্বল্পোন্নত দেশ কম্বোডিয়ার মোট ২২০ কোটি ডলার রপ্তানির বিপরীতে শুল্ক প্রদান করেছে প্রায় ৩৭ কোটি ডলার। অথচ একই সময়ে যুক্তরাজ্য আমেরিকায় পাঁচ হাজার ৩৫০ কোটি ডলারের রপ্তানির জন্য শুল্ক প্রদান করেছে মাত্র ৪৩ কোটি ডলার। এ সময় ফ্রান্স তিন হাজার ৬৮০ কোটি ডলার রপ্তানির জন্য শুল্ক দিয়েছে মাত্র ৩৬ কোটি ৭০ লাখ ডলার। অথচ যুক্তরাজ্য বা ফ্রান্স যেকোনো বিচারে বাংলাদেশ বা কম্বোডিয়ার চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে বহুগুণ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। এবং এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ কোনোভাবেই এমডিজির প্রতিশ্রুতি বা চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। সে কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার দাবি উঠেছে।

অবাধ বাজার-সুবিধা

- বলা যেতে পারে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মাধ্যমে বহুপাক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর (এলডিসি) পক্ষ থেকে অনেকদিন ধরেই যে দাবিটি তোলা হচ্ছে, তা হলো সব এলডিসির সব পণ্যে বিশ্বজনীন বাজার-সুবিধা প্রদান করা। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে হংকংয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে এলডিসিসমূহের একটা আশা ছিল যে ডব্লিউটিও-র সদস্য দেশগুলো শেষ পর্যন্ত এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। কিন্তু হংকং সম্মেলন এই আশা পূরণ করতে পারেনি। বরং হংকং ঘোষণায় (সংযোজনী ৩৬এফ) বলা হয়, উন্নত দেশগুলোর বাজারে এলডিসিসমূহের মোট রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সর্বোচ্চ ৯৭% কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার-সুবিধা পাবে। কথিত 'অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলো'তেও এলডিসিসমূহ যে বাজার-সুবিধা আশা করেছিল, তা গুড়ে বালি হয় যায়, যখন ঘোষণায় বলা হয় যে 'উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে যাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব' তারা এলডিসিগুলোর পণ্যসমূহকে ২০০৮ সালের মধ্যে বাজার-সুবিধা দেবে। সর্বোপরি এই ঘোষণায় এই কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে 'একই রকম অবস্থায় থাকা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো'র রপ্তানির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর ফলে এলডিসিগুলোকে বাজার-সুবিধা দেওয়ার বর্ণিত ঘোষণাকেও কার্যত ছোট করা হয়েছে, পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এভাবে এমডিজি অর্জনে বৈশ্বিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটি বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

- এখানে বলা দরকার যে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত বাজার-সুবিধার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাস্তবিক স্বার্থ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শূন্য শুল্কে প্রবেশাধিকার পাওয়া। কারণ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও কানাডাসহ সব উন্নত দেশ

ইতিমধ্যেই জিএসপি কর্মসূচির আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়েছে। এখন আমেরিকায় বাজার শুল্কমুক্ত-সুবিধা পেলে তা বৈশ্বিক সুবিধায় পরিণত হবে।

ন্যায্য বাণিজ্যের দাবি

- প্রশ্ন জাগতে পারে, এমডিজির সঙ্গে তাহলে কি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিরোধ রয়েছে? উত্তরটা হলো—না, বিরোধ নেই। কারণ, এমডিজির এই অষ্টম লক্ষ্যের অন্যতম লক্ষ্যমাত্রা হলো 'একটি মুক্ত, নিয়মভিত্তিক, নিশ্চিত ও বৈষম্যহীন বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলা।' এর মানে হলো ন্যায্য বাণিজ্য ও সাহায্যপ্রবাহ। এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় আমরা যে বহুপক্ষীয় বিশ্ববাণিজ্যের কথা বলে থাকি, তা কিন্তু ন্যায্য হয়ে উঠতে পারেনি। এটাকে ন্যায্য করার জন্য উন্নত দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো : ধনী দেশগুলো তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৭% 'আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা' হিসেবে গরিব দেশগুলোকে প্রদান করবে। বাস্তবতা অবশ্য বলে ভিন্ন কথা। কোনো দেশই আজ পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। অনেকেই অবশ্য সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে।

এমডিজির অর্থায়ন : বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের হাতে সময় আছে আর মাত্র ছয় বছর। এখন এই ছয় বছরের মধ্যে (২০০৯–২০১৫) এমডিজি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে ১০ হাজার ৪১৮ কোটি ডলারের (৭ লাখ ১২ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা) সমপরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হবে। এর মধ্যে সরকারিভাবেই ব্যয় করতে হবে সাত হাজার ৮৬৫ কোটি ডলার বা পাঁচ লাখ ৪২

হাজার ৬৮৫ কোটি টাকা। বাকিটা হবে ব্যক্তিপর্যায়ে বা বেসরকারি খাতে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ এবং জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থা ইউএনডিপি যৌথভাবে এই হিসাবটি তৈরি করেছে।

- এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চরম দারিদ্র্য হ্রাস ও ক্ষুধা নির্মূল, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা ও নারী ক্ষমতায়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, প্রসূতিস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ মোকাবিলা করা এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার কয়েকটি লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভালো করেছে। তবে এগুলো ধরে রাখতে এবং যেগুলোতে পিছিয়ে পড়ছে সেটাকে এগিয়ে নিতে এই বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন।

- এমডিজির প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে ১৯৯০ থেকে ২০১৫–এ সময়ে চরম দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষ, যাদের আয় দিনপ্রতি এক ডলারের নিচে, তাদের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত ৫৮.৮%। ২০০৫ সালে এটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪০%। বাকি সময়ে আরো ১১% লোককে দারিদ্র্যসীমার নিচে নামিয়ে আনতে হবে। আর এ কাজ করতে হলে সবচেয়ে বেশি দরকার কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গ্রামীণ পরিবহন-অবকাঠামো বাড়িয়ে বাংলাদেশ ২০১৫ সালের মধ্যে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে সক্ষম হবে। এজন্য ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে শুধু কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারকে খরচ করতে হবে ২ হাজার ৩২০ কোটি ডলার (বা ১ লাখ ৫৮ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা)।

- দ্বিতীয় লক্ষ্যে বলা হয়েছে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে নিট ভর্তির হারে অগ্রগতি করতে পারলেও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠ শেষ করার সূচকে লক্ষ্য থেকে পিছিয়ে পড়ছে। ১৯৯০ সালে যারা ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার হার ৪০%। ২০০৭ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১.৯%-এ। কিন্তু লক্ষ্য অর্জন করতে হলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার হারকে শতভাগে উন্নীত করতে হবে। আর এজন্য ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারকে ব্যয় করতে হবে ১ হাজার ৫৯০ কোটি ডলার ।
- তৃতীয় লক্ষ্য অর্থাৎ নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ব্যয় করতে হবে ৪১১ কোটি ডলার (২৮ হাজার কোটি টাকা)। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনকে এক করে সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ১৩৩ কোটি ডলার (১৪৫ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা)। আর টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে অর্থাৎ দেশের বনভূমির আনুপাতিক হার বাড়ানো, জীববৈচিত্র্য ধরে রাখা, জ্বালানি-দক্ষতা বাড়ানো, সুপেয় পানি ও উন্নত পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা এবং মাথাপিছু কার্বন ডাই-অক্সাইডের নির্গমনের পরিমাণ কমানোর জন্য ব্যয় করতে হবে ১ হাজার ৪১১ কোটি ডলার।

এমডিজি নিয়ে প্রতিবেদন : কিছু পরামর্শ

- শুরুতেই বলা হয়েছে, এই হ্যান্ডবুকের বা সহায়িকার প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমডিজি বিষয়ে গণমাধ্যমের, বিশেষত সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন তৈরির কাজে সাংবাদিকদের সহায়তা দেওয়া। সে ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন আসে, কেন

এমডিজি নিয়ে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন হবে? বা কেন এমডিজি নিয়ে রেডিও-টেলিভিশনে প্রতিবেদন প্রচারিত হবে?

- অল্পকথায় উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করা যাক। এমডিজির মূল সুর হলো সুস্থ-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে মানুষের জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মান উন্নয়ন ঘটানো। এবং তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এখন এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে জাতীয় পর্যায়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য নির্ধারণ করলেই হলো না। এটি অর্জনের জন্য কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু এই কাজ শুধু সরকারের একার দায়িত্ব নয়। একইভাবে এমডিজি নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে শুধু তাদেরও নয়। যেহেতু দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনকে এমডিজি ছুঁয়ে যায়, সেহেতু প্রতিটি মানুষেরই এ বিষয়ে জানার ও বোঝার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে সচেতন হওয়ার। এই সচেতনতাবোধ তৈরির জন্য গণমাধ্যম যে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। সে কারণেই প্রয়োজন এমডিজি নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করা। সবচেয়ে বড় প্রয়োজন কিন্তু মানুষ কীভাবে বেঁচে আছে, তার সমস্যা-সুযোগ এবং এসবের অগ্রগতি খোঁজ রাখা আর কোনদিকে আরও প্রয়াস দরকার তা বলা।

শুধু গাণিতিক পরিমাপের বিষয় নয়

- এখানে মনে রাখতে হবে এমডিজি শুধু গাণিতিক পরিমাপ করার বিষয় নয়, বরং তার চেয়ে বেশি এটি হলো কর্মের বিষয়। সন্তান জন্মদানকালে কতজন মায়ের মৃত্যু হয়—শুধু এই হিসাব নেওয়া নয়, বরং সন্তান জন্মদানকালে মায়ের মৃত্যু যেন রোধ করা যায়—এটাই

হলো এমডিজির মূল কথা। একইভাবে কতজন বাংলাদেশী শিশু অপুষ্টির শিকার তা জানার পাশাপাশি এই শিশুরা যেন ঠিকমতো পুষ্টিকর খাবার পেতে পারে তা নিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি। আসলে এমডিজির প্রকৃত সুবিধা হলো এই যে এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সবার নজরে এসেছে ও আসছে। সাংবাদিক হিসেবে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে, এলাকার সমাজকর্মী হিসেবে বা উন্নয়নকর্মী হিসেবে—যে যেভাবেই কাজ করুক না কেন, এমডিজির বিষয়গুলো তার কাছে যত স্পষ্ট হবে, সে তত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে সক্ষম হবে।

- এমডিজির ইতিবাচক দিক হলো, এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। এর সীমাবদ্ধতা হলো এটি শুধু সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করা যায়। এমন দিকেই মনোযোগী হয়েছে। আর তাই অনেক সময় এমডিজিকে অতি সরলীকরণে দুষ্ট বলা হয়। এমডিজির মাধ্যমে গুণগত মান যাচাই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিক্ষার কথাই ধরা যাক। এটা শুনতে সবারই ভালো লাগবে যে বাংলাদেশের ৯০% শিশুই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। তাহলে আর ১০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনা গেলেই এমডিজির নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু যে ৯০% শিশু স্কুলে যায় তাদের স্কুলে বসার বেঞ্চ আছে কি না, বিদ্যালয় ভবনের চাল ফুঁড়ে পানি ঝরে কি না ইত্যাদি বিষয়গুলো কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তাই শুধু বিদ্যালয়ে গেলেই মানসম্মত বা ভালো শিক্ষা অর্জন হয়ে যায় না।

গুণগত পরিমাপ কি অসম্ভব?

- গুণগত বিষয়টি যখন আলোচনায় চলে এল, তখন এ প্রশ্নটাও আসতে পারে যে কেন গুণগত পরিমাপের দিকটি

এমডিজিতে উপেক্ষিত হলো? উত্তরটা হলো : কাজটা খুবই কঠিন, অসম্ভব নয়। শিক্ষকদের যোগ্যতা বা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ফলাফলের দিকে তাকানো যেতে পারে। তবে তা খুব সহজসাধ্য নয়। আবার বাংলাদেশের মতো ১৪ কোটি লোকের দেশে দারিদ্র্যের মাত্রায় অঞ্চলভেদে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে দারিদ্র্যের প্রকোপ অনেক বেশি। জাতীয় পর্যায়ে ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করলেও উত্তরাঞ্চলে মোট জনগোষ্ঠীর ৬০%-ই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। আর তাই জাতীয় পর্যায়ের পরিমাপক বা মানদণ্ডটির সীমাবদ্ধতা থেকে যাচ্ছে। এমডিজির এসব সীমাবদ্ধতা মেনেই এটি নিয়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ হচ্ছে।

- তুলনামূলকভাবে দেখলে শিক্ষার তুলনায় স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতি বেশ কঠিন কাজ। যেমন : শিক্ষায় উন্নতি বা অন্য গতির বিষয়টি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ও ঝরে পড়ার সংখ্যা দিয়ে যেভাবে বিচার করা যেতে পারে, হাসপাতালে রোগী ভর্তির পরিসংখ্যান দিয়ে স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি যাচাই করা যাবে না। মানে কার্যকর স্বাস্থ্যসেবাই স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতির একমাত্র সূচক নয়; বা বলা যায়, একমাত্র অর্জন নয়। মানুষজন ধূমপান করছে কি না বা ঠিকমতো পুষ্টিকর খাদ্য খাচ্ছে কি না, এসব বিষয়ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য যে বিষয়ই হোক না কেন, এর অর্জন/অগ্রগতি বিষয়ে নির্দেশক বা লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা সম্ভব। যেমন : নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ বা বিশুদ্ধ খাওয়ার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন করা—ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রাগুলো নির্ধারণ কোনো অবাস্তব বিষয় নয়। বৃহত্তর পরিসর থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে নেমে এসেও যেকোনো বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা যেতে পারে।

প্রতিবেদনের পরিধি

এমডিজি-ভিত্তিক কোনো প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিবেদন সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। এসব বিবেচনাই নির্ধারণ করে দেয় প্রতিবেদনের পরিধি।

জাতীয় বনাম আঞ্চলিক

এমডিজির ক্ষেত্রটি অনেক বড় ও বিস্তৃত। জাতীয় পর্যায় থেকে গ্রামের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি গ্রামে শিশুর অপুষ্টি কিংবা শিক্ষার অবস্থা জাতীয় পর্যায়ের চিত্র নির্মাণে সহায়ক। সে কারণে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়েও এমডিজি নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে। এখন জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবেদনের পরিধি অনেক বড় হবে, এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রতিবেদনের পরিধি তুলনামূলকভাবে ছোট হবে। তার মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রতিবেদনের গুরুত্ব কম।

আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ

ঢাকার বাইরে যাঁরা থাকেন ও কাজ করেন, তাঁরা অনেক সময় এই ভেবে বিভ্রান্ত হন যে আঞ্চলিকভিত্তিতে বা আঞ্চলিক পর্যায়ে এমডিজি নিয়ে কাজ করা বোধ হয় সম্ভব নয়। কারণ এমডিজির সবকিছুই জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হলে এমডিজির বিভিন্ন দিক নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কোনো একটি জেলা বা উপজেলার অথবা কোনো একটি গ্রামে গিয়েও এমডিজি নিয়ে কাজ করার অবকাশ আছে। কারণ, এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকগুলোর খুঁটিনাটি সবকিছু নয়। এর চেতনা বা মূল সুরটি অনেক বেশি তাৎপর্যবাহী। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

উদাহরণ : কোনো একটি ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসেবার কী অবস্থা, তা নিয়ে কাজ শুরু করলে দেখা যাবে, নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। সেখানে একটি-দুটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে সেটার ওপর বিশেষ নজর দিলে তা এমডিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। ওই ইউনিয়নে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুমৃত্যুর অবস্থা নিয়ে সাংবাদিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। তিনি ইউনিয়নের বা উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে পারেন যে গত কয়েক বছরে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে কতজন মায়ের মৃত্যুর হয়েছে। এটা ঠিক যে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এ-সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য থাকবে—এমনটা আশা করা বোকামি। তবে যা তথ্য পাওয়া যাবে, তার ভিত্তিতে দু-একটি গ্রামে নিজে কিছু নমুনা জরিপ করতে পারেন। এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে এ বিষয়ে তারা কতটা সচেতন এবং তারা কতটা জানেন। এ সবকিছু মিলিয়ে এমন একটি প্রতিবেদন হতে পারে যে এই ইউনিয়নের বা গ্রামের মানুষরা পাঁচ বছর আগে মাতৃস্বাস্থ্যের বিষয়ে যতখানি জানত, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি জানে। আর তাই সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মায়ের মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। অথবা উল্টোটাও হতে পারে যে অবস্থা পাঁচ বছর আগে যা ছিল, এখনো তা-ই আছে। ফলে মাতৃমৃত্যুর হার তেমন একটা কমেনি। বিষয়টি এমডিজির পাঁচ নম্বর লক্ষ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তার মানে এই না যে একদম এই লক্ষ্যের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। সেটার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য হবে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মাতৃমৃত্যুর বিষয়ে সচেতনতা। এমডিজির মূলে রয়েছে এই সচেতনতা গড়ে তোলা। সচেতনতা যত বাড়বে তত মাতৃমৃত্যুর হার কমবে। আর তা সার্বিকভাবে লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সহায়ক হবে।

স্থানীয় পর্যায়ের গুরুত্ব

আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে ২০১৫ সাল আসতে আর মাত্র ছয় বছর সময় বাকি থাকলেও সর্বাত্মক চেষ্টা নিয়ে কাজ করলে সেটা খুব কম সময় নয়। এটাও মনে রাখতে হবে যে স্থানীয় পর্যায়ের অগ্রগতিগুলো যুক্ত হয়েই জাতীয় পর্যায়ের অর্জন সম্ভব হয়। তাই স্থানীয় পর্যায়কে অবহেলা বা উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই।

মাতৃমৃত্যুর মতো প্রাথমিক শিক্ষা, শিশুমৃত্যুর হার, রোগবালাই পরিস্থিতি নিয়েও এমডিজির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এমন প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে; এবং তা স্থানীয় পর্যায়েই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একটি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলোর পারস্পরিক তুলনা বা একটি জেলায় অন্তর্গত উপজেলাগুলোর অবস্থার পারস্পরিক তুলনা নিয়ে প্রতিবেদন হতে পারে।

উদাহরণ : ২০০৯-১০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি দলিল থেকে আমরা জানতে পারি যে খুলনা জেলার 'মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প' নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। এটি ২০০৪ সালের জুলাই মাসে চালু হয়েছে। আর ২০১০ সালের জুন মাসে শেষ হবে। (পৃ. ২৪৮)। এই প্রকল্পের জন্য এই অর্থবছরের ৬৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এখন খুলনার একজন সাংবাদিক এই প্রকল্পের অগ্রগতি ও অবস্থা নিয়ে কাজ করতে পারেন। তিনি প্রকল্পটির অবস্থা সম্পর্কে সরকারি অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করতে পারেন। তারপর মংলা পৌরসভার অধিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করতে পারেন যে গত কয়েক বছরে পানি সরবরাহ পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়েছে কি না। পয়োনিষ্কাশন-ব্যবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে কি না। মানুষজনের

সঙ্গে কথা বলে ও সরেজমিনে কিছু এলাকা পরিদর্শন করে তিনি যে তথ্য পাবেন, তার সঙ্গে সরকারি প্রতিবেদনের মিল বা বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করতে পারেন। এ বিষয়ে কোনো বেসরকারি সংস্থার কাজ থাকলে তা দেখতে পারেন। তারপর তৈরি করতে পারেন তাঁর নিজের প্রতিবেদনটি।

সরকারের প্রতিশ্রুতি

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে প্রথমে জানা দরকার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলো কী। তারপর জানতে হবে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের চিত্র বা অবস্থা।

সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলো জাতীয় পর্যায়ের থেকে শুরু করে আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। আর তাই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়টি দুই মাত্রায় খতিয়ে দেখা যায়। একটি হলো জাতীয় বা সার্বিক পর্যায়ে। অপরটি হলো মাঠ পর্যায়ে। এর মাধ্যমে সরকার অর্জনের কথা কী বলছে এবং বাস্তবে চিত্র কেমন দেখা যাচ্ছে—জনগণের কাছে তার একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনে সরকারি প্রতিশ্রুতির বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করা সম্ভব। মোটা দাগে এটাই হলো প্রতিবেদনের পরিধি। এ ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মানুষের অবস্থা ও উন্নয়নের পরিস্থিতি জানতে এবং সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রমের খোঁজখবর নিতে গেলে তা কার্যত এমডিজি প্রতিবেদনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, পরিধিও নির্ণয় করে।

লক্ষ্য ও সূচকের সঙ্গে মেলানো

প্রতিবেদনের বিষয়টি জাতীয় না আঞ্চলিক পর্যায়ের, তার ওপর নির্ভর করবে এমডিজির লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা বা সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার বিষয়টি। জাতীয় পর্যায়ের বিষয় হলো যতটা

সহজে এমডিজির সঙ্গে মেলানো যেতে পারে, আঞ্চলিক পর্যায়ে ততটা হবে না। এমডিজির কোন লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের সঙ্গে প্রতিবেদনের বিষয়টি সংগতিপূর্ণ তা দেখতে হবে। অনেক সময় হয়তো সূচকের সঙ্গে কোনো সংগতি খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ থাকবে।

উদাহরণ : যদি বিষয়টা হয় জাতীয় পর্যায়ে শিশুর অপুষ্টির হার, তাহলে তা অবশ্যই এমডিজির সঙ্গে সরাসরি মিলিয়ে দেখার সুযোগ আছে। এটি এমডিজি অর্জনের একটি নির্দেশিকা হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে এটি এমডিজির চতুর্থ লক্ষ্যের অন্তর্গত ষষ্ঠ (৪.এ) লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। আর বিষয়টা যদি হয়, কোনো একটি জেলার শিশুদের অপুষ্টির অবস্থা, তাহলেও তা এমডিজির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সুযোগ আছে। এই প্রতিবেদনেও এমডিজির প্রাসঙ্গিক লক্ষ্য, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের উল্লেখ করা যাবে। তবে তা জাতীয় পর্যায়ের মতো বৃহত্তর পরিসরে বিবেচিত হবে না।

আয়তন

প্রতিবেদনের আয়তনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকের চেষ্টা করা উচিত সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তগুলো গুছিয়ে পরিবেশন করা। বেশি কথা বলার বা বেশি তথ্য দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। অল্প কথায় গুছিয়ে বলার কুশলতা অর্জন করা গেলে সেটি কাজে সহায়ক হবে। ৪০০/৫০০ শব্দের মধ্যে সুন্দর প্রতিবেদন তৈরি করা অসম্ভব কিছু কাজ নয়। স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও সুলিখিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাংবাদিকের নিজস্ব চেষ্টাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি। এজন্য সবার আগে চাই পরিকল্পনা।

পরিকল্পনা

বস্তুত যেকোনো বিষয়ের মতোই এমডিজি নিয়ে প্রতিবেদন করতে গেলে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতে হবে। শুধু প্রতিবেদন হতে পারে, আবার ফিচারধর্মী প্রতিবেদনও হতে পারে। এটা নির্ভর করবে প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রতিবেদকের চিন্তাশীলতার ওপর। ধারাবাহিক প্রতিবেদনও হতে পারে, ফলোআপ প্রতিবেদনও হতে পারে। এসব প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে এমডিজির মূল লক্ষ্যের সঙ্গে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনার সুযোগ তৈরি হবে। পরিকল্পনা ছাড়া ভালো কাজ করার কোনো সুযোগ নেই। তাই পরিকল্পনা করতে হবে।

চলমান বিষয়ে মনোযোগ

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় দেশের ভেতর মূল আলোচনায় চলে আসে। সে বিষয়গুলো নিয়ে নানা ধরনের তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে। পত্রিকার পাতায় ও টেলিভিশনের পর্দায় এর প্রতিফলন ঘটে। আগ্রহী প্রতিবেদক ইচ্ছে করলে চলমান বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে এমডিজির মূল লক্ষ্যগুলোর সাযুজ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারেন। জানার চেষ্টা করতে পারেন এসব বিষয়ের অগ্রগতি বা বাস্তবায়ন এমডিজির কোনো লক্ষ্য বা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক না প্রতিবন্ধক। এ বিষয় হতে পারে দুর্নীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা; কিংবা মানবাধিকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা ইত্যাদি।

> **উদাহরণ-১ :** জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত : বিশ্বজুড়েই এখন জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নিয়ে ব্যাপক হইচই চলছে। বাংলাদেশেও বিষয়টি নিয়ে জোর আলোচনা হচ্ছে। পত্রপত্রিকায় এ নিয়ে নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এসব প্রতিবেদনের কোনোটা সেমিনার-আলোচনার খবর, কোনোটা বা গবেষণা ফলাফলের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে প্রণীত, কোনোটা আবার মাঠ পর্যায়ের খবর।

এসব প্রতিবেদনের সঙ্গে এমডিজি সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে, এমডিজির সপ্তম লক্ষ্যে যেখানে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ১৭ নভেম্বর 'প্রথম আলো'র শেষ পাতায় একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : 'আইলায় ক্ষতিগ্রস্তরা পাঁচ মাসেও ঘরে ফিরতে পারছে না।' আর ১৮ নভেম্বর প্রথম আলোর শেষ পাতায় আরেকটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'আইলাদুর্গত কয়রায় পানির সংকট।' প্রতিবেদন দুটি ঘূর্ণিঝড় আইলায় বিপর্যস্ত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর সরেজমিন। প্রতিবেদন দুটো পাঠ করলে দেখা যাবে, এর কোথাও এমডিজির কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রতিবেদন দুটি এমডিজির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এমডিজির সপ্তম লক্ষ্যের অধীনে ১৪তম লক্ষ্যমাত্রায় নিয়মিতভাবে সুপেয় পানি পায় না, জনসংখ্যার এমন জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হার ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকের মধ্যে নামানোর কথা বলা হয়েছে। অথচ ২০১৫ সাল আসার ছয় বছর আগে দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে বাংলাদেশের মানুষের সুপেয় পানি প্রাপ্তি কতটা ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আবার বাড়ি-ঘরে ফিরতে না পারা আর রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয়গুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে যেতে পারছে না। কোনো কোনো স্কুলে পাঠদান চলছে রাস্তার ওপরে। এই অবস্থা এমডিজির দ্বিতীয় লক্ষ্য অর্জনে যে কোনোভাবেই সহায়ক নয়, তা বোধ হয় সহজেই বোঝা যায়।

উদাহরণ-২ : টিফা বিতর্ক : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রূপরেখা চুক্তি (টিফা) করা না করার বিষয়ে বিতর্কটি সংবাদপত্রে স্থান পেয়েছে। এ রকম একটি প্রতিবেদন গত ১৭ নভেম্বর দৈনিক সমকালের শিল্প ও বাণিজ্য পাতা (পৃ. ১৮) প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল : 'টিফা জনসম্মুখে প্রকাশের দাবি ব্যবসায়ীদের'। এই

প্রতিবেদনে টিফা নিয়ে মার্কিন সরকারের আগ্রহ ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে এমডিজি বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এমডিজির অষ্টম লক্ষ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকের সঙ্গে টিফাকে মিলিয়ে দেখা সুযোগ রয়েছে। যেমন : অষ্টম লক্ষ্যের লক্ষ্যমাত্রায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশেষ প্রয়োজন মেটানো এবং কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অথচ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাজারসুবিধা প্রাপ্তির সঙ্গে টিফাকে জড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, টিফা ছাড়া বাজারসুবিধা পাওয়া যাবে না। এটি উন্নত দেশ হিসেবে এমডিজি বাস্তবায়নে সহায়তার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

মৌলিক করণীয়

- *নির্ভুল তথ্য প্রদান :* এমডিজি-বিষয়ক প্রতিবেদনে যেটুকু তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করা হবে, তা নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। এখানে সমস্যা হতে পারে সঠিক তথ্য পাওয়া নিয়ে। সরকারি একেক দলিলেই একেক রকম তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে যে দলিল বা প্রকাশনা থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে, সেই দলিল বা প্রকাশনার নাম উল্লেখ করে দিতে হবে। যেমন : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা : ২০০৯।

- *যাচাই :* এমডিজি বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে দেখা দরকার। যে অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সেখানকার অবস্থা যথাসম্ভব সরেজমিনে দেখা দরকার। নিশ্চিত হওয়া দরকার সংবাদে যেসব তথ্য যাচ্ছে, তা ঠিক আছে কিনা।

- *সূত্র উল্লেখ :* কোন তথ্য কার কাছ থেকে বা কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যথাসম্ভব তা জানাতে হবে।

- *ভারসাম্য রক্ষা :* ভারসাম্য রক্ষা মানে এই না যে সবাইকে তুষ্ট করে প্রতিবেদন করা। বরং, যে ঘটনাটি তুলে আনা হচ্ছে, তাতে যেন কোনো পক্ষপাতদুষ্টতা বা আক্রোশ প্রকাশ না পায়। এমডিজির শিক্ষা নিয়ে কোনো একটি প্রতিবেদন করতে গেলে যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য বা মতামত তুলে ধরতে হবে। বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে।

- *মানবিক প্রেক্ষাপট :* এমডিজির পুরোটাই মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই বিষয়ের মানবিক দিক তুলে আনা প্রয়োজন। জড়িত মানুষজন, তাদের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি তুলে আনতে পারলে প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়।

তথ্য-উপাত্ত ও দলিল

প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত দরকার। একই সঙ্গে দরকার সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। সুতরাং এসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি তথ্য-উপাত্ত রয়েছে। একইভাবে রয়েছে আঞ্চলিক পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত। সেজন্য বিভিন্ন সরকারি দলিল দেখা যেতে পারে।

এমডিজি যেহেতু উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম নির্দেশক হিসেবে কাজ করে, সেহেতু স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলো ও বাস্তবায়নের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

- *পিআরএসপি :* ধরা যাক, দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) কথা। তিন বছর মেয়াদি এই সরকারি দলিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য কমানো ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার কথা আছে।

- *পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা :* আবার সরকার এখন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দলিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হবে। বিশেষ করে, যে দলিলটি প্রণীত হতে যাচ্ছে, সেটির মেয়াদ এমডিজির মেয়াদের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পরিকল্পনাটির মেয়াদ হবে ২০১১–১৫। আর ২০১৫ সাল হলো এমডিজি অর্জনের শেষ বছর। যেহেতু ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হবে, সেহেতু তার সঙ্গে এমডিজির লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রাগুলো মিলিয়ে দেখার সুযোগ তৈরি হবে।

- *বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :* বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। প্রতিবছর জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে সরকার এডিপি চূড়ান্ত করে। এডিপিকে উন্নয়ন বাজেট হিসেবেও দেখা হয়। এডিপির দলিল থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়।

- *জাতীয় বাজেট :* প্রতিবছর জাতীয় বাজেট প্রণয়ন করে সরকার। বাজেট দলিল থেকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগসহ বিভিন্ন খাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দের পরিকল্পনা জানা যায়। সুতরাং বাজেটের দলিল দেখাটা প্রতিবেদন তৈরির কাজে বেশ হয়। এই দলিলগুলো যেহেতু বছরভিত্তিক, সেহেতু বছরওয়ারি কাজের অবস্থা বুঝতে পারা যাবে। বাজেটের বরাদ্দ থেকে যেমন অনেক কিছু জানা-বোঝা যায়, তেমনি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির দলিল থেকে জাতীয় পর্যায়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ের অনেক বিষয় জানা-বোঝা যেতে পারে।

- *এমডিজি বিষয়ক সরকারি প্রতিবেদন :* বাংলাদেশ সরকার এমডিজি অগ্রগতি নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে সর্বশেষটি হলো Millennium

Development Goals: Bangladesh Progress Report 2008। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০০৯ সালে এটি প্রকাশ করেছে।

- *দারিদ্র্য মানচিত্র (Poverty Map):* এটি একটি প্রয়োজনীয় দলিল। এর মধ্য থেকে জেলা পর্যায়ের এমনকি উপজেলা পর্যায়ের দারিদ্র্য পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র পাওয়া সম্ভব। একইভাবে জানা সম্ভব আঞ্চলিক বৈষম্যের বিষয়টি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (ডব্লিউএফপি) যৌথ উদ্যোগে 'বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র' প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত দুই দশকে দেশের দারিদ্র্য হার ৫৭% থেকে ৪০%-এ নেমে এসেছে। এর মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সবচেয়ে কম ঢাকা বিভাগে, এর হার ৩১%। সবচেয়ে বেশি ৪৫%–৫২% রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগ। সিলেটে ৩১%–৩৩%, চট্টগ্রামে ৩৪% এবং খুলনায় ৩৩%–৪৫%। বিভাগওয়ারি দেশের সবচেয়ে দরিদ্র এলাকা বরিশাল ও রাজশাহী। জেলাওয়ারি হিসাব করলে নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, রংপুর, জামালপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও বান্দরবানের দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। কয়েকটির ক্ষেত্রে দারিদ্র্য-হার ৬০% ছাড়িয়ে গেছে। [www.bbs.gov.bd/dataindex/povertymb.pdf]

- *আরও দলিল :* জাতিসংঘের উন্নয়ন সংস্থার (ইউএনডিপি) বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলপত্র এমডিজি বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হবে। এগুলো প্রায় সবই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইটের একটি তালিকা এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া আছে। এ ছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার এমডিজি-বিষয়ক কাজ রয়েছে। পিপলস ফোরাম অন এমডিজিস, উন্নয়ন সমন্বয়, সুপ্র প্রভৃতি সংস্থা বিভিন্নভাবে এমডিজি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। প্রস্তুত করছে

ছায়া প্রতিবেদন। এসব সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন, বিশ্লেষণ, তথ্যকণিকা প্রকাশ করে থাকে। এমডিজি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ও কর্মশালা করে থাকে। সেগুলো কাজের জন্য অনেক সহায়ক হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়

স্থানীয় পর্যায় থেকে বিভিন্ন প্রতিবেদন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কোনো একটি বিষয়ের ওপর বিস্তারিত প্রতিবেদন হতে পারে। আর এটা হতে পারে বিভিন্ন প্রতিবেদকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। আর আমরা যদি বৃহত্তর প্রেক্ষিতে চিন্তা করি, তাহলে পিআরএসপি বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বরাদ্দ, বাস্তবায়নের অবস্থা, লক্ষ্যচ্যুতি ও ব্যর্থতা সর্বোপরি সফলতার মাত্রা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ রয়েছে।

সম্পাদকীয় নীতি

- পত্রিকায় তথা সংবাদপত্রে এমডিজি-বিষয়ক প্রতিবেদন কতটা গুরুত্ব পাবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতির ওপর। সম্পাদকীয় নীতি প্রভাবিত করার ক্ষমতা হয়তো প্রতিবেদকেরা রাখেন না, তবে এমডিজির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করতে কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিভিন্নভাবে এমডিজি-বিষয়ক প্রতিবেদন স্থান পাচ্ছে। এ থেকে বোঝা যায়, সম্পাদকীয় নীতি এমডিজিকে গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে। সেদিক থেকে এমডিজির প্রতিবেদন তৈরি করতে উৎসাহের কোনো ঘাটতি হওয়ার কথা নয়।

- এখানে যা বিশেষভাবে প্রয়োজন, তা হলো এমডিজির বিভিন্ন লক্ষ্যকে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করা। শুধু প্রতিবেদন তৈরি করাই নয়,

বরং প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়, ফিচার এমনকি ফটোফিচারও হতে পারে এমডিজি-ভিত্তিক যদি সম্পাদকীয় নীতি এ ক্ষেত্রে অনুকূল হয়। আবার সংবাদপত্র চায় মানুষের দুঃখকষ্টের কথা তুলে ধরতে। সে ক্ষেত্রে এমডিজি সংগত কারণেই গুরুত্ব পেতে পারে।

কাজে বিশেষায়ণ করা

- সংবাদপত্রে প্রতিবেদকরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকেন। কিন্তু সবাই সব বিষয় নিয়ে কাজ করেন বা করতে পারেন না। বাস্তবে তা পারা সম্ভবও নয়। সে কারণেই আমরা দেখি যে সাংবাদিকদের 'বিট' থাকে। কেউ শিক্ষা, কেউ স্বাস্থ্য, কেউ বা বাণিজ্য নিয়ে কাজ করেন। এভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়ণ হয়ে থাকে।

- এমডিজিতেও এই বিশেষায়ণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আটটি লক্ষ্য থেকে যেকোনো দু-তিনটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা যেতে পারে। তাহলে ওই লক্ষ্যগুলো নিয়ে গভীরভাবে কাজ করার ও প্রতিবেদন তৈরি করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমনটি ভাবার কোনোই কারণ নেই যে গোটা এমডিজি বিষয়ে একজন সাংবাদিককে বিশেষজ্ঞ হতে হবে, কোনো সাংবাদিক বিশেষজ্ঞ হতে পারেন না, হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে তাঁকে অবশ্যই জানতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তিনি কোথায়, কার কাছে ও কীভাবে তথ্য-উপাত্ত পেতে পারেন; কোথায় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন; কার কাছে তিনি বিষয়গুলো বুঝতে সহায়তা পেতে পারেন। এই জানা-বোঝাই তাঁকে উদ্দিষ্ট কাজটি করার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পরিসংখ্যান ব্যবহার

- আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। সেটা হলো পরিসংখ্যান ব্যবহার। প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সেজন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরিসংখ্যানের ভাষা বোঝা। এমডিজি নিয়ে কাজ করতে চাইলে নানা ধরনের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। কিন্তু সবই প্রাসঙ্গিক বা প্রয়োজনীয় নয়। বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে হবে। হিসাবপত্র যাচাই করে দেখতে হবে।

- পরিসংখ্যানকে উদাহরণ দিয়ে মানবিক করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা যেতে পারে। পরিসংখ্যান উপস্থাপনে লেখচিত্র বা গ্রাফ ব্যবহার করা বিশেষ সহায়ক। বিস্তারিত না লিখে বরং লেখচিত্রের সাহায্য নিলে তা পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য হয়। আমরা আগের অধ্যায়েই বলেছি, এমডিজি শুধু পরিমাপ করার বিষয় নয়, বরং তার চেয়ে বেশি এটি হলো কর্মের বিষয়। পরিসংখ্যান ব্যবহারের সময় সে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

প্রয়োজনীয় কিছু ওয়েবসাইট

ওয়েবসাইট ঘাঁটলে এমডিজি বিষয়ে হাজার হাজার দলিলপত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু সবগুলোই যে প্রাসঙ্গিক ও কাজের হবে, এমন নয়। সেজন্য এখানে বাছাই করা কয়েকটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া হলো। এগুলো থেকে এমডিজির বৈশ্বিক অবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের চিত্রও জানা যাবে।

আবার বাংলাদেশের উন্নয়নের বিভিন্ন দলিলপত্র দেখানোর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার। সেজন্যও কিছু প্রাসঙ্গিক সরকারি-বেসরকারি ওয়েবসাইটের তালিকা দেওয়া হলো।

তবে এটা কোনো পরিপূর্ণ তালিকা নয়। ‘গুগলে সার্চ’ দিয়ে এমডিজি বিষয়ে অনেক ওয়েবসাইট পাওয়া সম্ভব। সম্ভব, বিভিন্ন দেশের এমডিজির চিত্র পাওয়া। সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইট বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশভিত্তিক :

http ://www.undp.org.bd/mdgs.php
http ://www.bangladesh-bank.org/
http ://www.erd.gov.bd/
http ://www.mof.gov.bd/
http ://www.bbs.gov.bd

জাতিসংঘভিত্তিক :

http ://www.un.org/millenniumgoals/
http ://www.unmillenniumproject.org/
http ://mdgs.un.org/unsd/mdg/
http ://www.undp.org/mdg/basics.shtml

অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাভিত্তিক :

http ://www.mdgmonitor.org/
http ://www.dfid.gov.uk/global-issues/millennium-development-goals/
http ://www.adb.org/poverty/mdgs.asp
http ://www.fao.org/mdg/en/
http ://www.mdgasiapacific.org/
http ://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/
http ://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdg.htm
http ://www.unmillenniumproject.org/
http://www.who.int/topics/millenniumdevelopment_goals/en/

এমডিজি-সংক্রান্ত :

http ://www.millenniumpromise.org
http ://www.endpoverty2015.org/

সংবাদমাধ্যমভিত্তিক :

http ://ipsnews.net/new_focus/devdeadline/index.asp

অন্যান্য :

http ://www.saarc-sec.org/main.php?t=2.12.5

এমডিজির পুরোটাই মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই বিষয়ের মানবিক দিক তুলে আনা প্রয়োজন। জড়িত মানুষজন, তাদের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি তুলে আনতে পারলে প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেড়ে যায়।